স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

# ধর্মবিজ্ঞান

স্বামী বিবেকানন্দ

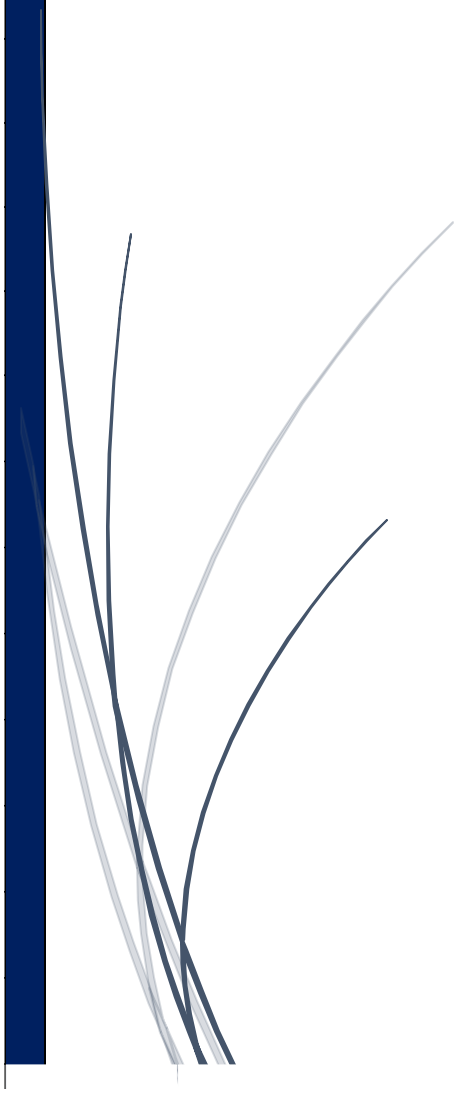

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

# সূচিপত্র

১. সূচনা ..... 2
২. সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ..... 8
৩. প্রকৃতি ও পুরুষ ..... ২ ০
৪. সাংখ্য ও অদ্বৈত ..... ৩ ৫
৫. মুক্ত আত্মা ..... ৪ ৯
৬. বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা ..... ৬ ৫
৭. আত্মার একত্ব ..... ৭ ৭
৮. জ্ঞানাযোগের চরমাদর্শ ..... ৪ ৬

# ১. সূচনা

আমাদের এই জগৎ-এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-যাহার তত্ত্ব আমারা যুক্তি ও বুদ্ধি-বলে বুঝিতে পারি, তাহার উভয় দিকেই অনন্ত, উভয় দিকেই অজ্ঞেয়-'চির-অজ্ঞাত' বিরাজমান। যে জ্ঞানালোক জগতে 'ধর্ম' নামে পরিচিত, তাহার তত্ত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়; যে-সকল বিষয়ের আলোচনায় ধর্মলাভ হয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা। স্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকারভুক্ত, ইন্দ্রিয় রাজ্যের নয়।উহা সর্বপ্রকার যুক্তির অতীত, সুতরাৎ উহা বুদ্ধির রজ্যের অধিকার নয়। । উহা দিব্যদর্শন-স্বরূপ-মানব মনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাবস্বরূপ, উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা আমাদের অধিক পরিচিতি করিয়া দেয়, কারণ জ্ঞান কখনও 'জ্ঞাত' হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানব সমাজের প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে এই ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি এক জগদতীত বস্তুর জন্য এই অনুসন্ধান-এই প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে-এই মানব মানে-আমরা দেখিতে পাই, একটি চিন্তার উদয় হইল; কোথা হইতে উহার উদয় হইল তাহা আমরা জানি না; আর যখন উহা তিরোহিত হইল, তখন উহা যে কোথায় গেল, তাহাও আমরা জানি না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যেন একই পথে চলিয়াছে, এক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া যেন উভয়কেই চলিতে হইতেছে, উভয়েই যেন এক সুরে বাজিতেছে।

এই বক্তৃতাসমূহে আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব যে, ধর্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত; উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজ দেহমনকে অস্বীকার করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন-ভাব ত্যাগ করিতে পারে, ততদিন তাহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব। যতদিন মানবের চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এব ততদিন কোন্-না-কোন

আকারে তাহার ধর্ম থাকিবেই থাকিবে।এই জন্যই আমরা জগতে নানাপ্রকারের ধর্ম দেখিতে পাই। অবশ্য এই আলোচনা আমাদের হতবুদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যে এরূপ চর্চাকে বৃথা কল্পনা মনে করেন, তাহা ঠিক নয়। নানা আপাতবিরোধী বিশৃঙ্খলার ভিতর সামঞ্জস্য আছে, এই-সব বেসুরা-বেতালার মধ্যেও ঐক্যতান আছে; যিনি উহা শুনিতে প্রস্তুত, তিনিই সেই সুর শুনিতে পাইবেন।

বর্তমান কালে সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এইঃ মানিলাম, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের উভয় দিকেই অজ্ঞেয় ও অনন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ অনন্ত অজ্ঞাতকে জানিবার চেষ্টা কেন? কেন আমরা জ্ঞাতকে লইয়াই সন্তুষ্ট না হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাণ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকি? এই ভাবের কথাই চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। খুব বড় বড় বিদ্বান্ অধ্যাপক হইতে অনর্গল কথা-বলা শিশুর মুখেও আমরা আজকাল শুনিয়া থাকি-জগতের উপকার কর, ইহাই একমাত্র ধর্ম, জগদতীত সত্তার সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করার কোন ফল নাই। এই ভবটি এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া থাকিবার জো আমাদের নাই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যেন সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ-আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জগদতীতকে না জানিলে কিরূপে উহার এই ক্ষুদ্র প্রকাশের বাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝা যাইতে পারে? কথিত আছে, সক্রেটিস্ একদিন এথেন্সে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়-ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, 'মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্বোচ্চ কর্তব্য-মানবই মানবের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু।' ব্রাহ্মণ তৎক্ষাণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানিতেছেন, ততক্ষণ মানুষকে কিরূপে জানিবেন?' এই ঈশ্বর, এই চির অজ্ঞেয় বা নিরপেক্ষ সত্তা, বা অনন্ত, বা নামের অতীত বস্তু-তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা তাহাতেই ডাকা যায়-এই বর্তমান জীবনের যাহা কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলেরই একমাত্র যুক্তিযুক্ত বাখ্যাস্বরূপ। যে-কোন বস্তুর কথা-নিছক জড় বস্তুর

কথা ধরুন। কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটি, যথা-রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া অলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমূদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।

এইরূপ মানুষকে বাধ্য হইয়া জগদতীত সত্তার আলোচনা করিতে হয়। যদি আমরা ঐ তত্ত্ব জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, মানবজীবন বৃথা হইবে। এ-কথাবলিতে ভাল যে বর্তমানে যাহা দেখিতেছ, তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাকো; গোরু, কুকুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট, আর ঐ ভাবেই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানুষ বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগদতীত সত্তার অনুসন্ধান একাবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ধর্মই-জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়া থাকে। এটি অতি সুন্দর কথা, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই স্বভাবতঃ উপরের দিকে চাহিয়া দেখে; অন্যান্য সকল জন্তুই স্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই উর্ধ্বদৃষ্টি, উর্ধ্বদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অনুসন্ধানকেই ‘পরিত্রাণ’ বা ‘উদ্ধার’ বলে; আর যখনই মানুষ উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে এই পরিত্রাণ-রূপ সত্যের ধারণার দিকে নিজেকে উন্নীত করে। পরিত্রাণ-অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহা মানুষের মস্তিষ্কস্থ আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। উহাতেই মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ই মানসিক সর্ববিধ উন্নতির মূল; ঐ প্রেরণাশক্তিবলে-ঐ উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সন্মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ধর্ম-প্রচুর অন্ন ও পানে নাই, অথবা সুরম্য হর্ম্যেও নাই। বারংবার ধর্মের বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শনিতে পাইবেনঃ ধর্মের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে? উহা কি দরিদ্রের দারিদ্র দূর করিতে পারে? মনে করুন, উহা যেন পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল? মনে করুন আপনি একটি জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত প্রমান করিতে চেষ্টা

করিতেছেন-একটি শিশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি মনোমত খাবার পাওয়া যায়?' আপনি উত্তর দিলেন-'না, পাওয়া যায় না।' তখন শিশুটি বলিয়া উঠিল, 'তবে ইহা কোন কাজের নয়।' শিশুরা তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন জিনিসে কত ভাল খাবার পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, সংসারের সেই শিশুদের বিচারও ঐরূপ। নিম্নভূমির দৃষ্টি হইতে উচ্চতর বস্তুর বিচার করা কখনই কর্তব্য নয়। প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজস্ব মনের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। অনন্তের দ্বারা অনন্তকে বিচার করিতে হইবে। ধর্ম সমগ্র মানবজীবনে অনুস্যূত, শুধু বর্তমানে নয়-ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সর্বকালে। অতএব ইহা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধ। অতএব ক্ষনিক মানবজীবনের উপর উহার কার্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্যায়সঙ্গত?- কখনই নয়। এগুলি সব নেতিমূলক যুক্তি।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ধর্মের দ্বারা কি প্রকৃতপক্ষে কোন ফল হয়? হাঁ হয় ; উহাতে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যাহা, তাহা এই ধর্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মনুষ্য-নামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। ধর্মই ইহা করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দাও-কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে এই সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরন্য হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় সুখ মানব জীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, পশুগন ইন্দ্রিয়সুখে যতটা প্রীতি অনুভব করে, মানুষ বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে ; আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ অধিকতর সুখবোধ করিয়া থাকে। অতএব আধ্যাত্মিকজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে। জাগতিক সকল বস্তুই সেই প্রকৃত জ্ঞান ও আনন্দের ছায়ামাত্র-শুধু তিন চারি ধাপ নিম্নের প্রকাশ।

আর একটি প্রশ্ন আছে : আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে-ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই 'ক্রমাগত নিকটবর্তী হওয়া অথচ কখনও লক্ষ্যস্থলে

না পৌঁছানো'-ইহার অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভূত হউক, ইহা যে অসম্ভব তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখনও কোন প্রকার গতি হইতে পারে? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটি বৃত্তরুপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়া ছিল সেখানেই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি সেখানেই অবশ্য শেষ করিতে হইবে; আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্য ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তবে ইতি মধ্যে আর করিবার কি থাকে? ঐ অবস্থায় পৌঁছিবার উপযোগী বিশেস বিশেস খুঁটিনাটি কার্যগুলি করিতে হয়-অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়।

আর একটি প্রশ্ন এইঃ আমরা উন্নতিপথে আগ্রসর হইতে হইতে কি ধর্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। আপনারা দেখিবেন, জগতের সকল ধর্মাবলম্বীই বলিয়া থাকেন, আমাদের ধর্মে একটি একত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা আর অধিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান-অর্থে এই একত্ব-আবিষ্কার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে পৃথক দেখিতেছি-ইহাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুইটি ভাবকে একত্র করিয়া দেখি এবং আপনাদিগকে কেবল 'মানবজাতি' বলিয়া অভিহিত করি, তখন উহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরনস্বরূপ রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরুন। রসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদানে পরিনত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে এক ধাতু হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় তাঁহারা কখন উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না ; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ন হইবে।

আর একটি প্রশ্ন আছে : আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে-ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই 'ক্রমাগত নিকটবর্তী হওয়া অথচ কখনও লক্ষ্যস্থলে

না পৌঁছানো'-ইহার অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভূত হউক, ইহা যে অসম্ভব তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখনও কোন প্রকার গতি হইতে পারে? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটি বৃত্তরুপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়া ছিল সেখানেই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি সেখানেই অবশ্য শেষ করিতে হইবে; আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্য ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তবে ইতি মধ্যে আর করিবার কি থাকে? ঐ অবস্থায় পৌঁছিবার উপযোগী বিশেস বিশেস খুঁটিনাটি কার্যগুলি করিতে হয়-অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়।

আর একটি প্রশ্ন এইঃ আমরা উন্নতিপথে আগ্রসর হইতে হইতে কি ধর্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। আপনারা দেখিবেন, জগতের সকল ধর্মাবলম্বীই বলিয়া থাকেন, আমাদের ধর্মে একটি একত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা আর অধিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান-অর্থে এই একত্ব-আবিষ্কার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে পৃথক দেখিতেছি-ইহাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুইটি ভাবকে একত্র করিয়া দেখি এবং আপনাদিগকে কেবল 'মানবজাতি' বলিয়া অভিহিত করি, তখন উহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরনস্বরূপ রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরুন। রসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদানে পরিনত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে এক ধাতু হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় তাঁহারা কখন উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না ; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ন হইবে।

# ২. সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব

দুইটি শব্দ রহিয়াছে-ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ; অন্তঃ ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারা এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি- আভ্যান্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যান্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ-মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত ; আর বাহ্য অনুভূতি হইতে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পূর্ন সত্য, তাহার সহিত এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যসমূহে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেইরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যে সাক্ষ্য দিবে। বর্হিজগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জগতের সত্যের প্রমানও বর্হিজগতে পাওয়া চাই। তথাপি আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, এই-সকল সত্যের অধিকাংশই সর্বদা পরস্পর বিরোধী। পৃথিবীর ইতিহাসের একযুগে দেখা যায়, ‘অন্তর্বাদী’র প্রধান্য হইল’; অমনি তাঁহারা ‘বহির্বাদী’র সহিত বিবাদ আরাম্ভ করিলেন। বর্তমান কালে ‘বহির্বাদী’ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ ও দার্শনিকগনের অনেক সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে দেখতে পাই, মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত সারভাগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

প্রকৃতি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি দেন নাই; এজন্য একই জাতি সর্বপ্রকার বিদ্যার অনুসন্ধানে সমান শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলি জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, কিন্তু প্রাচীন ইউরোপীয়গন মানুষের অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যেরা বাহ্য জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে তত দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু অন্তর্জগতের গবেষনায় তাঁহারা খুব দক্ষ দেখাইয়াছেন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় কতগুলি প্রাচ্য মতবাদের সহিত পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞানের মিলে না, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাচ্যজাতির ঐ-বিষয়ক উপদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচ্য জড়বিজ্ঞানীদের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই সত্যের ভিত্তিতে

প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, যে-কোন বিদ্যাতেই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্য সত্যের সমন্বয় আছে।

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তাহা আমরা জানি; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদিগণের কিরুপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক একটি নতূন নতূন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতির মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কি ধারণা ছিল, তাহা আলোচনা করিব; তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্যভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়ার সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে; আর যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকেই। ইংরেজীতে আমারা সকলে Nature (নেচার) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন হিন্দুদার্শনিকগণ উহাকে দুইটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতেন; প্রথমটি ‘প্রকৃতি’-ইংরাজী Nature শব্দের সহিত উহা প্রায় সমার্থক; আর দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম-‘অব্যক্ত’, যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নয়, উহা হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা হইতে অণু-পরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উহা হইতেই জড়বস্তু ও শক্তি, মন ও বুদ্ধি-সব আসিয়াছে। ইহা অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ অনেক পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, মন সুক্ষ্ম জড়মাত্র। ‘দেহ যেমন প্রকৃতি হইতে প্রসূত, মনও সেরূপ’- ইহা ব্যতীত আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা-আর অধিক কি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাই; ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রসূত।

প্রচীন আচার্যগণ এই অব্যক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেনঃ তিনটি শক্তির সাম্যাবস্থা। তন্মধ্যে একটির নাম সত্ত্ব, দ্বিতীয়টি রজঃ এবং তৃতীয়টি তমঃ। তমঃ-সর্বনিম্নতম শক্তি, আকর্ষণস্বরূপ; রজঃ তদপেক্ষা কিঞ্চিত উচ্চতর-উহা বিকর্ষণস্বরূপ; আর সর্বোচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংযমস্বরূপ-উহাই সত্ত্ব।

অতএব যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষন শক্তিদ্বয় সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি বা বিকার থাকে না ; কিন্তু যখনই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, এবং উহাদের মধ্যে একটি শক্তি অপরগুলি অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠে; তখনই পরিবর্তন ও গতি আরম্ভ হয় এবং এই সমুদয়ের পরিনাম চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে। অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তিসমূদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে, এবং তখনই এই ব্রহ্মাণ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তুই সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়, আবার এমন সময় আসে, যখন সকল অভিব্যাক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং শক্তিগুলি বহির্দিকে প্রসৃত হইবার উপক্রম করে, আর ব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইতে থাকে। জগতের সকল গতিই তরঙ্গাকারে হয়-একবার উত্থান, আবার পতন।

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কিছুদিনের জন্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হয় ; আবার অপর কাহারও মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। অর্থৎ মনে করুন, আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যাক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান্য সহস্র সহস্র জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে। আমি দ্বিতীয় মতটির অর্থাৎ প্রলয় যুগপথ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে-এই মতটিরই অধিকপক্ষপাতী। যাহাই হউক, মূল কথাটা উভয়ত্রই এক, অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা দেখেতেছি, এই সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতনের নিয়মে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় গমনকে ‘কল্পান্ত’ বলে। সমগ্র কল্পটিকে এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচকে-ভারতের ঈশ্বরবাদিগন ঈশ্বরেরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে তাহা হইতে যেন জগৎ বাহির হয়, আবার উহা তাহাতে প্রত্যাবর্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের কি অবস্থা হয়? তখনও উহা বর্তমান থাকে, তবে সূক্ষতররূপে বা কারণাবস্থায় থাকে। দেশ-কাল-নিমিত্ত সেখানেও

বর্তমান, তবে উহারা অব্যাক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অব্যাক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে ক্রমসঙ্কোচ বা প্রলয়' বলে। প্রলয় ও সৃষ্টি বা ক্রমসংকোচ ও ক্রমাভিব্যাক্তি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব আমরা যখন আদি বা আরম্ভের কথা বলি, তখনআমরা এক কল্পের আরম্ভকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বহির্ভাগকে-আজকাল আমরা যাহাকে স্থূল জড় বলি, প্রাচীন হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদগণ(পঞ্চ)'ভূত' বলিতেন। তাঁহাদের মতে ঐগুলিরই একটি অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূত 'আকাশ' নামে অভিহিত। আজকাল 'ইথার' বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা কতকটা তাহারই মতো, যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। আকাশই আদিভূত- উহা হইতেই সমুদয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে আর উহার সঙ্গে 'প্রাণ' নামে আর একটি বস্তু থাকে-ক্রমশ আমরা দেখিব, উহা কি। যতদিন সৃষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাকে। তাহারা নানা রূপে মিলিত হইয়া এই-সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে কল্পান্তে ঐগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্তন করে। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সৃষ্টিবর্ণনাত্মক একটি সূক্ত ১ আছে, সেটি অতিশয় কবিত্বপূর্ণঃ 'যখন সৎ ও ছিল না, অসৎ ও ছিল না, অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?'

আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছেঃ 'ইনি-সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ- গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন।'

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরূষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না । এই অবস্থাকে 'অবক্ত্য' বলে-উহার ঠিক শব্দার্থ স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত। একটি নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত করে, আকাশ ঘনীভূত হইতে থাকে, আর ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও ঘনীভূত হইয়া দ্ব্যণুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত, সেই-সকল বিভিন্ন স্থূল ভূতে পরিণত হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এইগুলির অতি অদ্ভুত ইংরেজী অনুবাদ করিয়া থাকে। অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের টীকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদেরও এত বেশী বিদ্য নাই যে, নিজে-নিজেই ঐগুলি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা 'পঞ্চভূতে'র অনুবাদ করিযা থাকেন বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি। যদি তাঁহারা ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, ভাষ্যকারগণ ঐগুলি লক্ষ্য করেন নাই। প্রাণের বারংবার আঘাতে আকাশ হইতে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয়, উহা হইতেই বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া শীতল হইতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারন করে, উহাকে 'অপ্' বলে ; অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম 'ক্ষিতি' বা পৃথিবী। সর্ব প্রথমে আকাশে স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর উহা তরল হইয়া যাইবে, আর যখন আরও ঘনীভূত হইবে, তখন উহা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারন করিবে। ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তুসকল তরল পদার্থে পরিনত হইবে, তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ভাব ধারন করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং সর্বশেষে সমূদয় শক্তির সামঞ্জস্য-অবস্হা উপস্হিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়- এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্যের সেই অবস্হা-পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারন করিবে।

আকাশের সাহায্য ব্যতীত প্রাণ একা কোন কার্য করিতে পারে না। প্রান সম্বন্ধে আমরা এইটুকু জানি যে, উহা গতি বা স্পন্দন। আমরা যা কিছু গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকার, এবং জড় বা ভূত-পদার্থ যা কিছু আমরা জানি, যা কিছু আকৃতিযুক্ত বা বাধাদান করে, তাহাই এই আকাশের বিকার। এই প্রাণ এককভাবে থাকিতে পারে না বা কোন মাধ্যম ব্যাতীত কার্য করিতে পারে না, আর উহার কোন অবস্হায়-উহা কেবল প্রাণরূপেই বর্তমান থাকুক অথবা মহাকর্ষ বা কেন্দ্রাতিগা শক্তিরূপ প্রাকৃতিক অন্যান্য

শক্তিতেই পরিণত হউক-উহা কখন আকাশ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। আপনারা কখন জড় ব্যাতীত শক্তি বা শক্তি ব্যাতীত জড় দেখেন নাই। আমরা যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি, সেগুলি কেবল এই দুইটির স্থুল প্রকাশমাত্র, এবং ইহাদের অতি সূক্ষ অবস্থাকেই প্রচীন দার্শনিকগণ 'প্রান' ও 'আকাশ' নামে অভিহিত করিয়াছে। প্রাণকে আপনারা জীবন শক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে বুঝিলেও চলিবে না। অতএব সৃষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন, এবং উহার আদিও নাই, অন্তও নাই ; উহার আদি-অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কারন অনন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি চলিয়াছে।

তারপর আর একটি অতি দুরহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে। কয়েকজন ইউরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, 'আমি' আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে, এবং 'আমি' যদি না থাকি তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখন কখন ঐ কথা এইভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে-যদি জগতের সকল লোক মরিয়া যায়, মনুষ্যজাতি আর না থাকে, অনুভূতি ও বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগৎপ্রপঞ্চও আর থাকিবে না। এ কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে আমরা স্পষ্ট দেখিব যে, ইহা প্রমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব জানিলেও মনোবিজ্ঞানঅনুসারে ইহা বাখ্যা করিতে পারেন না। তাঁহারা এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ আমরা এই প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদগণের আর একটি সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিব-উহাও একটু অদ্ভুত রকমের-তাহা এই যে, স্থুল ভূতগুলি সুক্ষ্ম ভূত হইতে উৎপন্ন। যাহা কিছু স্থুল, তাহাই কতকগুলি সুক্ষ্ম বস্তুর সমবায়। অতএব স্থুল ভূতগুলিও কতকগুলি সুক্ষ্মবস্তুগঠিত- ঐগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় 'তন্মাত্রা' বলে। আমি একটি পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি; উহার গন্ধ পাইতে গেলে কিছু অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐ পুষ্প রহিয়াছে-উহা যে আমার দিকে আসিতেছে, এমন তো দেখিতেছি না; কিন্তু কিছু যদি আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া থাকে, তবে আমি গন্ধ পাইতেছি কিরূপে?

ঐ পুষ্প হইতে যাহা আসিয়া আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্রা, ঐ পুষ্পেরই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু; উহা এত সূক্ষ্ম যে, যদি আমরা সারাদিন সকলে মিলিয়া

উহার গন্ধ আঘ্রাণ করি, তথাপি ঐ পুষ্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। তাপ, আলোক এবং অন্যান্য সকল বস্তু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই তন্মাত্রাগুলি আবার পরমাণুরূপে পুনর্বিভক্ত হইতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ লইয়া বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু আমরা জানি-ঐগুলি মতবাদ-মাত্র, সুতরাং বিচারস্থলে আমরা ঐগুলিকে পরিত্যাগ করিলাম। এইটুকু জানিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট-যাহা কিছু স্থূল তাহা অতি সূক্ষ্ম পদার্থদ্বারা নির্মিত। প্রথম আমরা পাইতেছি স্থূল ভূত-আমরা উহা বাহিরে অনুভব করিতেছি; তার পর সূক্ষ্ম ভূত-এই সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারাই স্থূল ভূত গঠিত, উহারই সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির স্নায়ুর সংযোগ হইতেছে। যে ইথার-তরঙ্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি জানি-আলোক দেখিতে পাইবার পূর্বে চাক্ষুষ স্নায়ুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন। শ্রবণ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রাগুলি আসিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমরা জানি-সেগুলি অবশ্যই আছে। এই তন্মাত্রাগুলির আবার কারণ কি? আমাদের মনস্তত্ত্ববিদগণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তন্মাত্রাগুলির কারণ 'অহংকার'-অহং-তত্ত্ব বা 'অহং-জ্ঞান'। ইহাই এই সূক্ষ্ম ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয়গুলিরও কারণ। ইন্দ্রিয় কোনগুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। চক্ষু যদি দেখিতে, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তো চক্ষু অবিকৃত থাকে, তবে তখনও তাহারা দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছুর পরিবর্তন হইয়াছে। কোন-কিছু মানুষের ভিতর হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর সেই কিছু, যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয়। এইরূপ এই নাসিকাও একটি যন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি ইন্দ্রিয় আছে। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞান আপনাদিগকে বলিয়া দিবে, উহা কি। উহা মস্তিষ্কস্থ একটি স্নায়ুকেন্দ্র মাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যযন্ত্র। অতএব এই স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান। নাসিকার জন্য একটি, চক্ষুর জন্য একটি, এইরূপ প্রত্যেকের জন্য এক-একটি পৃথক স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটিতেই কার্য সিদ্ধ হয় না কেন? এইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যাইতেছে। আমি কথা কহিতেছি, আপনারা শুনিতেছেন ; আপনাদের

চতুর্দিকে কি হইতেছে, তাহা আপনারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারন মন কেবল শ্রবনেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে নিজেকে পৃথক করিয়াছে। যদি একটি মাত্র স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মনকে একই সময়ে দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রান করিতে হইত। অতএব প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শরীর-বিজ্ঞানও এ বিষয়ে সাক্ষ দিয়া থাকে। অবশ্য আমাদের পক্ষে একই সময়ে দেখা ও শুনা সম্ভব, কিন্তু তাহার কারন-মন উভয় কেন্দ্রেই আংশিকভাবে যুক্ত হয়। তবে যন্ত্র কোনগুলি? আমরা দেখিতেছি, উহারা বাহিরের বস্তু এবং স্থুলভূতে নির্মিত-এই আমাদের চক্ষু কর্ন নাসা প্রভৃতি। আর এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিসে নির্মিত? উহারা সুক্ষতর ভূতে নির্মিত ; যেহেতু উহারা অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ, সে জন্য উহারা ভিতরের জিনিস। যেমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থুল শক্তিতে পরিনত করিবার জন্য এই দেহ স্থুলভূতে গঠিত হইয়াছে, তেমনি এই শরীরের পশ্চাতে যে স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে সুক্ষ অনুভূতির শক্তিতে পরিনত করিবার জন্য সূক্ষতর উপাদানে নির্মিত। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরনের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ(বা সূক্ষ) শরীর বলে।

এই সূক্ষ শরীরের প্রকৃতপক্ষে একটি আকার আছে, কারন যাহা কিছু জড় তাহারই একটি আকার অবশ্যই থাকিবে। ইন্দ্রিয়গনের পশ্চাতে মন অর্থাৎ বৃত্তিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে চিত্তের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা বলা যাইতে পারে। যদি স্থির হ্রদে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা কম্পন উপস্থিত হইবে, তারপর উহা হইতে বাধা বা প্রতিক্রিয়া উত্থিত হইবে। মুহূর্তের জন্য ঐ জল স্পন্দিত হইবে, তারপর উহা ঐ প্রস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিত্তের উপর যখনই কোন বাহ্যবিষয়ে আঘাত আসে, তখন উহা একটু স্পন্দিত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে মন বলে। তারপর উহা হইতর প্রতিক্রিয়া হয়, উহার নাম ‘বুদ্ধি’। এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটি জিনিস আছে, উহা মনের সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্তমান, উহাকে ‘অহঙ্কার’ বলে; এই অহঙ্কার অর্থে অহংজ্ঞান, যাহাতে সর্বদা ‘আমি আছি’ এই জ্ঞান হয়। তাহার পশ্চাতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, উহা প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চাতে পুরুষ, ইনিই মানবের যথার্থ স্বরূপ—শুদ্ধ, পূর্ণ; ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা এবং ইহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম।

পুরুষ এই সকল পরিণাম-পরম্পরা দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নন, কিন্তু অধ্যাস বা প্রতিবিম্বের দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সমক্ষে একটি লাল ফুল রাখিলে স্ফটিকটি লাল দেখাইবে, আবার নীল ফুল রাখিলে নীল দেখাইবে। প্রকতপক্ষে স্ফটিকটির কোন বর্ণই নাই। পুরুষ বা আত্মা অনেক, প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ। আর এই স্থূল, সূক্ষ্ম নানাপ্রকারে বিভক্ত পঞ্চভূত তাঁহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখাইতেছে। প্রকৃতি কেন এ-সকল করিতেছেন? প্রকৃতির এই-সকল পরিণাম পুরুষ নিজের মুক্ত স্বভাব জানিতে পারেন। মানুষের সমক্ষে এই জগৎপ্রপঞ্চরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহাতে মানুষ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণামে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে জগতের বাহিরে আসিতে পারেন। আমাকে এখানে আবশ্যই বলিতে হইবে যে, আপনারা যে অর্থে সগুণ বা ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আমাদের অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ সেই অর্থে তাঁহাতে বিশ্বাস করেন না। মনস্তত্ত্ববিদগনের পিতাস্বরূপ কপিল সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহার ধারণা এই যে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; যাহা কিছু ভাল, প্রকৃতিই তাহা করিতে সমর্থ। তিনি তথা-কথিত 'কৌশলবাদ' ( Design Theory) খণ্ডন করিয়াছেন। এই মতবাদের ন্যায় ছেলে মানুষী মত জগতে আর কিছুই প্রচারিত হয় নাই। তবে তিনি এক বিশেষ প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, এরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা যাইতে পারে। এইরূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারিব। কপিল বলেন, এইরূপ 'জন্য ঈশ্বর' হইতে পারা যায়, কিন্তু 'নিত্য ঈশ্বর' অর্থাৎ নিত্য সর্বশক্তিমান্-জগতের শাসনকর্তা কখনই হইতে পারা যায় না। এইরূপ ঈশ্বর-স্বীকারে এই আপত্তি উঠিবে : ঈশ্বর হয় বদ্ধ, না হয় মুক্ত—এই দুই-এর একতর ভাব স্বীকার করিতে হইবে ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন না, কারণ তাঁহার সৃষ্টি করিবার কোন

প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাতে সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব; কারণ বদ্ধ বলিয়া তাঁহার শক্তির অভাব, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখা গেল, নিত্য সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই হেতু কপিল বলেন, আমাদের শাস্ত্রে-বেদে যেখানেই ঈশ্বর-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে সকল আত্মা পূর্ণতা বা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। সাংখ্যদর্শন সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাসী নন। বেদান্তের মতে সকল জীবাত্মা ও ব্রহ্ম-নামধেয় এক বিশ্বাত্মা অভিন্ন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি অবশ্য জগতের বিশ্লেষণ যতদূর করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাদীগণের জনক স্বরূপ, পরবর্তী দর্শন-শাস্ত্রগুলি তাঁহারই চিন্তাপ্রণালীর পরিণাম মাত্র।

সাংখ্যদর্শন-মতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা-রূপ স্বাভাবিক অধিকারে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? সাংখ্য বলেন ইহা অনাদি। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন অনাদি হয়, তবে উহা অনন্তও হইবে, আর তাহা হইলে আমরা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই 'অনাদি' বলিতে নিত্য অনাদি বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু আত্মা বা পুরুষ যে অর্থে আনাদি অনন্ত, সে অর্থে নয়; কারণ প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নূতন নূতন জলরাশি আসিতেছে, এই সমুদয় জলরাশির নাম নদী, কিন্তু নদী কোন ধ্রুব বস্তু নয়। এইরূপ প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু, সর্বদা তাহার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু আত্মার কখনই পরিবর্তন হয় না। অতএব প্রকৃতি যখন সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

সাংখ্যদিগের একটি মত তাহাদের নিজস্ব, যথাঃ একটি মনুষ্য বা কোন প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে বিরচিত। সুতরাং আমার যেমন একটি মন আছে, সেইরূপ একটি বিশ্ব-মনও আছে। যখন এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, পরে অহঙ্কার, পরে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও শেষে স্থূলভূতের উৎপত্তি

হয়। কপিলের মতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি শরীর। যাহা কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সব স্থূল শরীর, উহাদের পশ্চাতে আছে সূক্ষ্ম শরীর এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি অহংতত্ত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি-বুদ্ধি। কিন্তু এ-সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতির বিকাশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে সকলেই এই মহত্বের অংশ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ জগতের ভিতরে সমষ্টি মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজনমত লইতেছি। কিন্তু দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া চাই। ইহাতে বংশানুক্রমিকতা (Heredity) ও পুনর্জন্মবাদ উভয় তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আত্মাকে দেহনির্মাণ করিবার জন্য উপাদান দিতে হয়, কিন্তু সে উপাদান বংশানুক্রমিক সঞ্চারের দ্বারা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, সাংখ্যমতানুযায়ী সৃষ্টিপ্রণালীতে সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসঙ্কোচ—এই উভয়টিই স্বীকৃত হইয়াছে। সমুদয় সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, আবার ঐ সমুদয় ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকিতে পারে না, মহতত্ত্বের অংশবিশেষ যাহার উপাদান নয়। উহাই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় প্রপঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে। তবে আমি এইটুকু দেখাইব, কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই টেবিলের স্বরূপ কি, তাহা আমি জানি না, উহা কেবল আমার উপর একপ্রকার সংস্কার জন্মাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে চক্ষুতে আসে, তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ে গমন করে, তারপর উহা মনের নিকটে যায়। তখন মন আবার উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই আমরা 'টেবিল' আখ্যা দিয়া থাকি। ইহা ঠিক একটি হ্রদে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায়। ঐ হ্রদ প্রস্তরখণ্ডের অভিমুখে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে; আর ঐ তরঙ্গটিকেই আমরা জানিয়া থাকি। মনের তরঙ্গসমূহ-যেগুলি বহির্দিকে আসে, সেগুলিই আমরা জানি। এইরূপে এই দেয়ালের আকৃতি আমার মনে রহিয়াছে; বাহিরে যথার্থ কি আছে, তাহা কেহই জানে না; যখন আমি কোন বর্হিবস্তুকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন উহাকে আমার প্রদত্ত উপাদানে পরিণত হইতে হয়।

আমি আমার নিজমনের দ্বারা আমার চক্ষুকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়াছি, আর বাহিরের যাহা আছে, তাহা উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণ আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই-আমরা সকলকেই একই বস্তু কিরূপে দেখিয়া থাকি। ইহার কারণ—আমাদের সকলের ভিতর এই বিশ্ব-মনের এক এক অংশ আছে। যাহাদের মন আছে তাহারাই ঐ বস্তু দেখিবে; যাহাদের নাই তাহারা উহা দেখিবে না। ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া জগৎ আছে, ততদিন মনের অভাব—সেই এক বিশ্ব-মনের অভাব কখন হয় নাই। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক প্রাণী সেই বিশ্ব-মন হইতেই নির্মিত হইতেছে, কারণ বিশ্বমন সর্বদাই বর্তমান থাকিয়া উহাদের নির্মাণের জন্য উপাদান যোগাইতেছে।

———

১ ঋগ্বেদ, ১০।১২৯ (নাসদীয় সূক্ত)।

# ৩. প্রকৃতি ও পুরুষ

আমরা যে তত্ত্বগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলাম, এখন সেইগুলির প্রত্যেকটিকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ উহাকে 'অব্যক্ত' বা অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাদানসকলের সাম্যাবস্থারূপে উহার লক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহা হইতে স্বভাবতই পাওয়া যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামঞ্জস্যে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সবই জড় ও গতির সমবায় মাত্র। এই প্রপঞ্চ-বিকাশের পূর্বে আদিম অবস্থায় যখন কোনরূপ গতি ছিল না, যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় ছিল, তখন এই প্রকৃতি অবিনাশী ছিল, কারণ সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পারে। আবার সাংখ্যমতে পরমাণুই জগতের আদি অবস্থা নয়। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি ভূতই পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তাহা আবার স্থূলতর পদার্থে পরিণত হয়, আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে, তাহা ঐ মতের পোষকতা করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ-ইথার সম্বন্ধীয় আধুনিক মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথারও পরমাণুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা মোটেই হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই বিষয় বুঝানো যাইতেছেঃ বায়ু অবশ্য পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। আর আমরা জানি, ইথার সর্বত্র বিদ্যমান, উহা সকলের মধ্যে ওতপ্রতভাবে বিদ্যমান ও সর্বব্যাপী। বায়ু এবং অন্যান্য সকল বস্তুর পরমাণুও যেন ইথারেই ভাসিতেছে। আবার ইথার যদি পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে দুইটি ইথার-পরমাণুর মধ্যেও কিঞ্চিত অবকাশ থাকিবে। ঐ অবকাশ কিসের দ্বারা পূর্ণ? আর যাহা কিছু ঐ অবকাশ ব্যাপিয়া থাকিবে, তাহার পরমাণুগুলির মধ্যে ঐরূপ অবকাশ থাকিবে। যদি বলেন, ঐ অবকাশের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর ইথার বিদ্যমান, তাহা হইলে সেই ইথার পরমাণুর মধ্যেও আবার অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইথার কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্ধান্ত কিছুই পাওয়া যাইবে না ইহাকে 'অনবস্থা-দোষ'

বলে। অতএব পরমাণুবাদ চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী, উহা এক সর্বব্যাপী জড়রাশি, তাহাতে-এই জগতে যাহা কিছু আছে—সমুদয়ের কারণ রহিয়াছে। কারণ বলিতে কি বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বুঝায়—যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই অব্যক্ত অবস্থা। ধ্বংস বলিতে কি বুঝায়? ইহার অর্থ কারণে লয়, কারণে প্রত্যাবর্তন—যে সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস-শব্দের এই অর্থ ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে 'কারণে লয়' করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহা দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন' ব্যতীত ধ্বংসের আর কোন অর্থ নাই। আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে—জড় বস্তুও অবিনশ্বর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যদি একটি কাঁচনলের ভিতর একটি বাতি ও কষ্টিক ( Caustic Soda) পেন্সিল রাখা যায় এবং সমগ্র বাতিটি পুড়াইয়া ফেলা হয়, তবে ঐ কষ্টিক পেন্সিলটি বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পেন্সিলটির ওজন এখন উহার পূর্ব ওজনের সহিত বাতিটির ওজন যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে। ঐ বাতিটিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া কষ্টিকে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের আধুনিক জ্ঞানোন্নতির অবস্থায় যদি কেউ বলে যে, কোন জিনিস সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে সে নিজেই কেবল উপহাসাস্পদ হইবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই ঐরূপ কথা বলিবে, আর আশ্চর্যের বিষয়—সেই প্রাচীন দার্শনিকগণের উপদেশ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিতেছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক ভাগটি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং উহাদ্বারা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আর আধুনিক বিজ্ঞান উহার ভৌতিক ( Physical) ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উভয় প্রকার বিশ্লেষণই একই সত্যে উপনীত হইয়াছে।

আপনাদের অবশ্য স্মরণ আছে যে, এই জগতেপ্রকৃতির প্রথম বিকাশকে সাংখ্যবাদিগণ ‘মহৎ’ বলিয়া থাকেন। আমরা উহাকে ‘সমষ্টি বুদ্ধি’ বলিতে পারি, উহার ঠিক শব্দার্থ–মহৎ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি; উহাকে অহংজ্ঞান বলা যায় না, বলিলে ভুল হইবে। অহংজ্ঞান এই বুদ্ধিতত্ত্বের অংশ মাত্র, বুদ্ধিতত্ত্ব কিন্তু সর্বজনীন তত্ত্ব। অহংজ্ঞান, অব্যক্ত জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা–এগুলি সবই উহার অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ : প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন মানবীয় বোধশক্তিরই আয়ত্ত নয়। এই উভয় প্রকার পরিবর্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ঐ উভয় প্রকার পরিবর্তনই সাধন করিতেছে। আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, যেগুলির আমাদের মন বা বিচারশক্তির অতীত। এই সকল পরিবর্তনই সেই মহতের মধ্যে। ব্যষ্টি লইয়া আমি যখন আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন এ কথা আপনারা আরও ভাল করিয়া বুঝিবেন। এই মহৎ হইতে সমষ্টি অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই দুটিই জড় বা ভৌতিক। জড় ও মনে পরিমাণগত ব্যতীত অন্য কোন রূপ ভেদ নাই–একই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা, একটি আর একটিতে পরিণত হইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে; মস্তিষ্ক হইতে পৃথক একটি মন আছে–এই বিশ্বাস এবং এরূপ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানের সহিত যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, পূর্বোক্ত বিশ্বাসের দ্বারা বরং ঐ বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহৎ-নামক এই পদার্থ অহংতত্ত্ব-নামক জড় পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্ত্বের আবার দুই প্রকার পরিণাম হয়, তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার–কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলিতে এই দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সূক্ষ্মতর–যাহাকে আপনারা মস্তিষ্ককেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্র বলেন। এই অহংতত্ত্ব পরিণামপ্রাপ্ত হয়, এবং এই অহংতত্ত্বরূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র ও স্নায়ুসকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বরূপ সেই একই উপাদান হইতে আর একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়–তন্মাত্রা, অর্থাৎ সূক্ষ্ম জড় পরমাণু।

যাহা আপনাদের নাসিকার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগকে ঘ্রাণ গ্রহণে সমর্থ করে, তাহাই তন্মাত্রার একটি দৃষ্টান্ত। আপনারা এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, আপনারা কেবল ঐগুলির অস্তিত্ব অবগত হইতে পারেন। অহংতত্ত্ব হইতে এই তন্মাত্রাগুলির উৎপত্তি হয়, আর ঐ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম জড় হইতে স্থূল জড় অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী ও অন্যান্য যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই। এটি ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ পাশ্চাত্য দেশে মন ও জড় সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। মস্তিষ্ক হইতে ঐ-সকল সংস্কার দূর করা বড়ই কঠিন। বাল্যকালে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ত্ব বুঝিতে প্রচণ্ড বাধা পাইতে হইয়াছিল।

এ সবই জগতের অন্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এই সর্বব্যাপী অখণ্ড অবিভক্ত জড়রাশি রহিয়াছে। যেমন দুগ্ধ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া দাবি হয়, সেরূপ উহা মহৎ নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়—ঐ মহৎ এক অবস্থায় বুদ্ধিতত্ত্বরূপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহা অহংতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। উহা সেই একই বস্তু, কেবল অপেক্ষাকৃত স্থূলতর আকারে পরিণত হইয়া অহংতত্ত্ব নাম ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন স্তরে স্তরে বিচরিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহতে পরিণত হয়, তাহা আবার সর্বব্যাপী অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারে এবং তাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতে পরিণত হয়। সেই ভূতসমষ্টি ইন্দ্রিয় বা স্নায়ুকেন্দ্রসমূহে এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত হইয়া এই স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। সাংখ্যমতে ইহাই সৃষ্টির ক্রম, আর সমষ্টি বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা আছে, তাহা সৃষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবশ্য থাকিবে।

---

১ ভাষায় ভঙ্গীতে পাঠকের মনে হইতে পারে, বুদ্ধিতত্ত্ব মহতের অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে; যাহাকে ‘মহৎ’ বলা যায়, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব।

২ পূর্বে সাংখ্যমতানুযায়ী যে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বামীজীর কিঞ্চিৎ বিরোধ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্বে বুঝানো হইয়াছে, অহংতত্ত্ব হইতে

ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি হয় এখানে আবার উহাদের মধ্যে ভূতের কথা বলিতেছেন। এটি কি কোন নূতন তত্ত্ব? বোধ হয়, অহংতত্ত্ব একটি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজী এইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের কল্পনা করিয়াছেন।

------

ব্যষ্টি-রূপ একটি মানুষের কথা ধরুন। প্রথমতঃ তাঁহার ভিতর সেই সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে। সেই জড়প্রকৃতি তাহার ভিতর মহৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের এক অংশ তাহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের ক্ষুদ্র অংশটি তাহার ভিতর অহংতত্ত্বে বা অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে–উহা সেই সর্বব্যাপী অহংতত্ত্বেরই ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই অহঙ্কার আবার ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রায় পরিণত হইয়াছে। তন্মাত্রাগুলি আবার পরস্পর মিলিত করিয়া তিনি নিজ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড–দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান স্বরূপ; আর ইহা আপনাদের জানা একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতে এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্যদর্শনে প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নয়। পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন। পরে উহা 'আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক সম্প্রদায়ের' ভিত্তিস্বরূপ হয় এবং আরো পরবর্তিকালে উহা নষ্টিক দর্শনের (Gnostic Philosophy) ভিত্তি হয়। এইরূপ উহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ ইওরোপ ও আলেকজান্দ্রিয়ায় গেল, অপর ভাগটি ভারতেই রহিয়া গেল এবং সর্বপ্রকার হিন্দুদর্শনে ভিত্তিস্বরূপ হইল। কারণ ব্যাসের বেদান্তদর্শন ইহারই পরিণতি। এই কপিল দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি বিচার দ্বারা জগতত্ত্ব ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম চেষ্টা। কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিত। আমি আপনাদের মনে এইটি বিশেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই যে, দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য। এমন কি বেদেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির–

এই সর্বপ্রাচীন দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার অনুভূতিসমুদয় কি অপূর্ব! যদি যোগিগণের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষশক্তির কোন প্রমাণপ্রয়োগ আবশ্যক হয়, তবে বলিতে হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা কিরূপে এই-সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন? তাঁহাদের তো আর অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের অনুভূতিশক্তি কি সূক্ষ্ম ছিল, তাহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দোষ ও কি অদ্ভুত!

যাহা হউক, এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। আমরা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—মানবের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে নির্মিত, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি। তারপর উহা বৈষম্যপ্রাপ্ত হইলে কার্য আরম্ভ হয়, আর এই কার্যের ফলে যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহা মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। এখন আপনারা দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহতের ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ। উহা হইতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব, তাহা হইতে অনুভাবাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুসকল এবং সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা। ঐ তন্মাত্রা হইতে স্থূল দেহ বিচরিত হয়। আমি এখানে বলিতে চাই, শোপেনহাওয়ার বলেন, বাসনা বা ইচ্ছা সমুদয়ের কারণ। আমাদের এই ব্যক্তভাবাপন্ন হইবার কারণ প্রাণধারণের ইচ্ছা, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। তাহারা বলেন, মহত্তত্ত্বই ইহার কারণ। এমন একটিও ইচ্ছা হইতে পারে না, যাহা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নয়। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্তু রহিয়াছে। উহা অহং হইতে গঠিত, অহং আবার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এবং তাহা আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার।

মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। এই মহত্তত্ত্ব—আমরা যাহাকে 'অহং' বলি, তাহাতে পরিণত হয়, আর এই মহত্তত্ত্বই সেই সকল পরিবর্তনের কারণ, যেগুলির ফলে এই শরীর নির্মিত হইয়াছে। জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানের অবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—এইসব মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এই তিনটি অবস্থা কি? জ্ঞানের নিম্নভূমি আমরা পশুদের মধ্যে দেখিয়া থাকি এবং উহাকে সহজাত জ্ঞান (Instinct) বলি। ইহা প্রায় অভ্রান্ত, তবে উহা দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা বড় অল্প। সহজাত জ্ঞানে প্রায় কখনই ভুল হয় না। একটি পশু ঐ সহজাতজ্ঞান-প্রভাবে

কোন্ শস্যটি আহার্য, কোনটি বা বিষাক্ত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু ঐ সহজাত জ্ঞান দু-একটি সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ, উহা যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া থাকে। তারপর আমাদের সাধারণ জ্ঞান—উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান ভ্রান্তপূর্ণ, উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু উহার গতি এইরূপ মৃদু হইলেও উহার বিস্তৃতি অনেকদূর। ইহাকেই আপনারা যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়া থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার অধিকদূর বটে, কিন্তু সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের আশঙ্কা। ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে, জ্ঞানাতীত অবস্থা—ঐ অবস্থায় কেবল যোগীদের অর্থাৎ যাঁহারা চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অধিকার। উহা সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তিবিচার অপেক্ষাও উহার অধিক প্রসার। উহা সর্বোচ্চ অবস্থা। আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানুষের ভিতর মহৎই—জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি—জ্ঞানের এই তিন অবস্থায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ—সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও বিচারাতীত জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত।

এখন একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্বদাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ বলি এবং উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচার-জনিত জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখইতে পাই না। এই প্রশ্নটিই একটি অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি একটি বৃহৎ বস্তু রাশি হইতে ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতই উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ আমরাই উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে করিলাম? প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক—যুক্তিবিচার কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞান অর্থে সাদৃশ্য অনুসন্ধান। রাস্তায় গিয়া একটি মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন-সেটি মানুষ। আপনারা অনেক মানুষ দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে একটি সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে। একটি নূতন মানুষকে দেখিবামাত্র

আপনারা তাহাকে নিজ নিজ সংস্কারের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া দেখিলেন, সেখানে মানুষের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নূতন ছবিটি অবশিষ্টগুলির সহিত উহাদের জন্য নির্দিষ্ট খোপে রাখিলেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার-সকল পূর্ব হইতে বর্তমান থাকে, তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই সংযোগ বা সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতে আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে ঐগুলির সহিত আর একটি অনুভূতিকে এক খোপে পোরা। আর আপনাদের পূর্ব হইতেই একটি জ্ঞান ভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। যদি আপনাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের যেমন মত-মন যদি 'অনুৎকীর্ণ ফলক' ( Tabula Rasa)- স্বরূপ হয় তবে উহার পক্ষে কোনপ্রকার জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব; কারণ জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতেই যে সংস্কার সমষ্টি অবস্থিত তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণ মাত্র। একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব হইতেই থাকা চাই। যাহার সহিত নূতন সংস্কারটি মিলাইয়া লইতে হইবে। মনে করুন, এই প্রকার জ্ঞানভাণ্ডার ছাড়াই একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা একেবারে অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে ঐ শিশুর অবশ্যই ঐরূপ একটি জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানলাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোনপথ দেখাইয়া দিন। ইহা গণিতের অভিজ্ঞতারর মতো। ইহা অনেকটা স্পেন্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের সিদ্ধান্তের মতো। তাঁহারা এই পর্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ অসম্ভব; অতএব শিশু পূর্বজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তবে এই দার্শনিকেরা বলেন যে, শিশু যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান হইতে লব্ধ নয়, উহা তাহার পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার মাত্র। অতিশীঘ্রই ইহারা বুঝিবেন যে, এই মতবাদ প্রমাণসহ নয়, আর ইতিমধ্যে অনেকে এই 'বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ' মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

এই মত অসত্য নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহা কেবল মানুষের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন—এই মতানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? তাহাতে ইহারা বলিয়া থাকেন, অনেক কারণ মিলিয়া একটি কার্য হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটি। অপর দিকে হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়িয়া তুলি; কারণ আমরা অতীত জীবনে যেরূপ ছিলাম, বর্তমানেও সেরূপ হইব। অন্য ভাবে বলা যায়, আমরা অতীতে যেরূপ ছিলাম, তাহার ফলে বর্তমানে যেরূপ হইবার সেরূপ হইয়াছি।

এখন আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়। জ্ঞান আর কিছুই নয়, পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটি নূতন সংস্কারকে এক খোপে পোরা—নূতন সংস্কারটিকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা 'প্রত্যাভিজ্ঞা'র অর্থ কি? পূর্ব হইতেই আমাদের যে সদৃশ্য সংস্কার সকল আছে, সেগুলির সহিত উহার মিলন আবিষ্কার করা। জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। তাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রণালীতে সদৃশ বস্তুশ্রেণীর সবটুকু আমাদের দেখিতে হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন আপনাকে একটি প্রস্তরখণ্ড জানিতে হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে উহার সদৃশ প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিতে হইবে। কিন্তু জগৎসম্বন্ধে আমরা তাহা করিতে পারি না, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার একপ্রকার অনুভব-মাত্র পাইয়া থাকি—উহার এদিকে ওদিকে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইয়া লইতে পারি। সে জন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য মনে হয়, কারণ জ্ঞান ও বিচার সর্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত সংযোগ-সাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশটি-যাহা আমাদের জ্ঞানাবিচ্ছিন্ন, তাহা আমাদের নিকট বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, উহার সহিত মিল খাইবে এমন কোন সদৃশ বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। এজন্য উহাকে লইয়া এত মুশকিল,—আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভয়ানক ও মন্দ; কখন কখন আমরা উহাকে ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে আমরা অসম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। জগৎকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা ইহার অনুরূপ কোন ভাব বা সত্তার সন্ধান পাইব। আমরা তখনই ঐগুলি ধরিতে পারিব, যখন আমরা এই

জগতের–আমাদের এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের বাহিরে যাইব, তখই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না আমরা তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিস্ফল চেষ্টার দ্বারা কখনই উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ জ্ঞান অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটি আংশিক ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমরা আমাদের সাধারণ প্রত্যাহিক ব্যাবহার্য ভাষায় যাহাকে 'ঈশ্বর' বলি, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাঁহার সম্বন্ধে এক বিশেষ প্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণামাত্র –তাহার অন্যান্য সমুদয় ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতার দ্বারা আবৃত।
'সর্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্যন্ত আমার অংশমাত্র।' ১
এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমরা তাহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ উহা অসম্ভব। তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায় যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়া–অহং-জ্ঞানের বাহিরে যাওয়া।
'যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা–এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই কেবল সত্য লাভ করিবে।' ২
'শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ শাস্ত্র প্রকৃতির তত্ত্ব পর্যন্ত, প্রকৃতি যে নি তিনটি গুণে নির্মিত–সেই পর্যন্ত (যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে)শিক্ষা দিয়া থাকে।' ৩
ইহাদের বাহিরে যাইলেই আমরা সামঞ্জস্য ও মিলন দেখিতে পাই, তাহার পূর্বে নয়।
এ পর্যন্ত এটি স্পষ্ট বুঝা গেল, এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একই নিয়মে নির্মিত, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি খুব সামান্য অংশই আমরা জানি।

––––––

১ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।–গীতা, ১০। ৪২
২ তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।–ঐ, ২।৫২
৩ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।–ঐ, ২।৪৫
––––––

আমরা জ্ঞানের নিম্নভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না; আমরা কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি। যদি কোন ব্যক্তি বলেন, আমি পাপী—সে নির্বোধমাত্র, কারণ সে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। সে নিজের একটি অংশ মাত্র জানে, কারণ জ্ঞান তাঁহার মানসভূমির মাত্র একাংশব্যাপী। সমগ্র ব্রহ্মান্ড সম্বন্ধেও ঐরূপ;যুক্তিবিচার দ্বারা উহার একাংশমাত্র জানাই সম্ভব; কিন্তু প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টিমহৎ এবং তাহাদের পরবর্তী সমুদয় বিকার—এই সবগুলি বুঝাইয়া থাকে, আর এইগুলি সাধারণ জ্ঞানের বা যুক্তির অতীত।

কিসের দ্বারা প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি প্রকৃতি নিজেও জড় বা অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ এবং অচেতন। মন মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি—এ সবই অচেতন। কিন্তু এগুলি এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই সবের অতীত, আর সাংখ্যমতাবলম্বিগন ইহাকে ‘পুরুষ’-নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরুষ জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল পরিণাম হইতেছে, সেগুলির সাক্ষিস্বরূপ কারণ, অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি বিশ্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।১ ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যাবহার্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কিরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে? ইচ্ছা-প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। সেগুলি কে সৃষ্টি করিল? ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ মাত্র, অর যাহা কিছু যৌগিক, সে সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছাও নিজে কখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা একটি অমিশ্র বস্তু নয়। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে—এরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছা অহংজ্ঞানের অল্পাংশমাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহা আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে।তাই যদি করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তো পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করিতেছে না।

হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নয়; কারণ যদি তাই যদি হইত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক—ইচ্ছা যাহার একটি বিকাশমাত্র। এই দেহকে এমন একটি শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইচ্ছা যাহার বিকাশমাত্র। সমগ্র জগৎ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না, সেজন্যই 'ইচ্ছা' বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন আমি মানিয়া লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তারপর ইচ্ছানুসারে আমি এই দেহ পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা তো আমারই দোষ, কারণ ইচ্ছাই আমাদের দেহ-পরিচালক—ইহা মানিয়া লইবার আমার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপ যদি আমরা মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ পরিচালন করিতেছে, তারপর দেখি প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা মিলিতেছে না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুরুষ ইচ্ছা নন বা বুদ্ধি নন, কারণ বুদ্ধি একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। কোনরূপ জড় পদার্থ না থকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। এই জড় মানুষে মস্তিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছে। যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন-না-কোন আকারে জড় পদার্থ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ কি? উহা মহত্তত্ত্ব নয়, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও নয়, কিন্তু উভয়েরই কারণ। তাঁহার সান্নিধ্যই উহাদের সবগুলিকে ক্রিয়াশীল করে ও পরস্পরকে মিলিত করায়। পুরুষকে সেই সকল বস্তুর কয়েকটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেগুলির শুধু সান্নিধ্যই রাসায়নিক কার্য ত্বরান্বিত করে, যেমন সোনা গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক্ থাকিয়া যায়, (শেষ পর্যন্ত) উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য হয় না, কিন্তু সোনা গলানো-রূপ কার্য সফল করিবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার কোনরূপ বিকার নয়, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা।

———-

১ ইতিপূর্বে মহত্তত্ত্বকে 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে, এখানে আবার পুরুষের সর্বজনীন ভাবকে ঈশ্বর বলা হইল। এই দুইটি কথা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। এখানে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পুরুষ মহত্তত্ত্বরূপ উপাধি গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'ঈশ্বর' বলা যায়।

---

'আমি সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত থাকায় প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সব কিছু সৃজন করিতেছে।' ১

তাহা হইলে প্রকৃতিতে এই চেতনা কোথা হইতে আসিল? পুরুষেই এই চেতনার ভিত্তি, আর ঐ চেতনাই পুরুষের স্বরূপ। উহা এমন এক বস্তু, যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না, কিন্তু আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, উহা তাহার উপাদান স্বরূপ। এই পুরুষ আমাদের সাধারণ জ্ঞান নয়, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক পদার্থ, তবে এই জ্ঞানে যাহা কিছু উজ্জ্বল ও উত্তম, তাহা ঐ পুরুষেরই। পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা এমন এক বস্তু, যিনি থাকাতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে যে চিৎ, তাহা প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের নিকট 'বুদ্ধি' বা 'জ্ঞান' নামে পরিচিত হয়। জগতে যে কিছু সুখ আনন্দ শান্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্তু ঐগুলি মিশ্র, কেন না উহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত আছে।

'যেখানে কোনপ্রকার সুখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ, সেখানে সেই অমৃতস্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে' । ২

এই পুরুষই সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, তিনি যদিও উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট ও উহার সহিত অসংসৃষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগতকে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষকে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহার কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা নারী যখন স্বামীকে চায়, তখন কোন্ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান ও সেই স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী শক্তি। তিনি সকলের পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ পড়িয়াছে। অন্য কিছুই কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই আচেনাত্মক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন। ইনিই

সাংখ্যের পুরুষ। অতএব ইহা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই সর্বব্যাপী, কারণ যাহা সর্বব্যাপী নয় তাহা অবশ্যই সসীম। সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাবই কোন কারণের কার্যস্বরূপ, আর যাহা কার্যস্বরূপ, তাহার অবশ্য আদি অন্ত থাকিবে। যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তস্বরূপ হইলেন না, তিনি কোন কারণের কার্যস্বরূপ—উৎপন্ন হইলেন। অতএব তিনি যদি সীমাবদ্ধ না হন, তবে তিনি সর্বব্যাপী। কপিলের মতে পুরুষের সংখ্যা এক নয়, বহু। অনন্ত সংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও একজন পুরুষ, প্রত্যেকেই এক একজন পুরুষ—উহারা যেন অনন্তসংখ্যক বৃত্তস্বরূপ। তাহার প্রত্যেকটি আবার অনন্ত বিস্তৃত। পুরুষ জন্মানও না, মরেনও না। তিনি মনও নন, জড়ও নন। আর আমরা যাহা কিছু জানি, সকলই তাহার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, যদি তিনি সর্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার জন্মমৃত্যু কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি তাঁহার উপর নিজ ছায়া—জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া প্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূর্ব।

———-

১ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।—গীতা, ৯। ১০

২ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহ. উপ. , ৪। ৩। ৩২

———-

এইবার আমরা এই সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। যতদূর পর্যন্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, এই বিশ্লেষণ নির্দোষ, ইহার মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতি কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর পাইলাম—উহা সৃষ্ট নয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ অসৃষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটি প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া উপস্থিত

হইব। আমরা প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন করিব : প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনন্ত কি করিয়া থাকিতে পারে? তার পর আমরা এই যুক্তি উত্থাপন করিব—উহা সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ (generalisation) ১ নয়, অতএব আমরা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। তারপর আমরা দেখিব, বেদান্তবাদীরা কিরূপে এই-সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলের প্রাপ্য। প্রায়-সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ।

———-

১ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করাকে generalisation বা সামান্যীকরণ বলে।

# ৪. সাংখ্য ও অদ্বৈত

প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিতেছিলাম, এখন তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ এই বক্তৃতায় আমরা ইহার ত্রুটি কোন্‌গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া কিরূপে ঐ অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে চাই। আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সব-কিছুরই বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি গুণ নয়,—জগতের উপাদান কারণ; এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, আর যুগ প্রারম্ভে এগুলি সামঞ্জস্যভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রার (অর্থাৎ যে-সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না) পর স্থূল পরমাণুসকলের উৎপত্তি—এগুলি আমরা অনুভব বা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই ত্রিবিধ কার্য-সমন্বিত চিত্ত প্রাণনামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রণের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখন ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির একটি কার্য মাত্র। কিন্তু এখানে ‘প্রাণসমূহ’ অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যেগুলি সমুদয় দেহটিকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এই প্রাণসমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্জ করিতেছে,

বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না। এই প্রাণসমূহ জীবনশক্তিরূপে সমুদয় শরীরের উপর কার্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার স্নায়ুকেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এ পর্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আর ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখনেই দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ চেষ্টা এই চিন্তা-প্রণালীর জনক কপিল নামক ব্যক্তির নিকট ঋণী।

এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব; কিন্তু আমরা যতই অগ্রসর হইব, ততই দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত আমাদিগকে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার; কারণ তাহার মতে কার্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে কার্য অন্যরূপে পরিণত কারণমাত্র১ আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম-প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই নিশ্চয়ই কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন ভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন প্রকৃতি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখম সীমাবদ্ধ হয়। ঐ উপাদানটি স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্যন্ত কোনটিই ‘পুরুষ’ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমপর্যায়ে নয়। একটা কাদার তাল যেমন, সমষ্টিমনও তেমনি, সমগ্র জগৎও তেমনি। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে-নিশ্চয়ই এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই-সব নানা বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল ‘পুরুষ’ বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাও উহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ মিশ্রিত পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নয়। উহাই একমাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চবিকারই জড়।

পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ককেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টিকে লইয়া আসিবে; উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে, মন আবার উহাকে অহংজ্ঞানরূপে অপর একটি পদার্থে আবৃত করিয়া 'মহৎ' বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং কার্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্তা। এগুলি সবই ভৃত্যরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়, তখন তিনি আদেশ দিলে 'মহৎ' প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা; তিনি কোন জড় বস্তু নন। যেহেতু তিনি জড় নন, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্রে বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ—এই কয়েকটি লইয়া সূক্ষ্মশরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের আধ্যাত্মিক দেহ বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরষ্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহার বারবার জন্ম হয়। কারণ আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা-যাওয়া অসম্ভব। 'গতি'-অর্থে আসা যাওয়া, আর যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখনও সর্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরই আসে যায়। এই পর্যন্ত আমরা কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম আত্মা অনন্ত এবং একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নয়। একমাত্র আত্মাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেইজন্য পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, 'আমি লিঙ্গশরীর, আমি স্থূলশরীর', আর সেই জন্যই তিনি সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখ আত্মার নয়, উহারা লিঙ্গশরীরের এবং স্থূলশরীরের। যখনই কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করি, তখনই তৎক্ষণাৎ আমরা উহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমার অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও কিছু বোধ করিব না। অতএব সুখদুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয়

নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে আমার চক্ষুযন্ত্র থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখ-দুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সুখ-দুঃখ আত্মার নয়; উহারা মনের ও দেহের।

---

১ কারণভাবাচ্চ । –সাংখ্যসূত্র, ১। ১১৮

---

আত্মার সুখ দুঃখ কিছুই নাই; আত্মা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আত্মা কোন কর্মের ফল গ্রহণ করে না।

'সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষুর দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষুর দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি।' ১

'যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দ্বারা সুখদুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।' ২

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে-ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় সেইরূপ। এই ধ্যানাবস্থাতেই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ পুরুষের সহিত আপনারা এই একত্ববোধ-জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নয়। উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

তারপর সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতির এই-সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানে সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা

---

১ কঠোপনিষদ্, ২। ২। ২২

২ কুসুমবচ্চ মণিঃ।–সাংখ্যসূত্র, ২। ৩৫

---

জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত পরিবর্তন-পরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আবার আত্মা যখন অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি কোন কালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন; তখন তিনি আরও দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আসা যাওয়া কিছুই নাই; স্বর্গে যাওয়া, আবার এখানে আসিয়া জন্মানো—সবই প্রকৃতির, তাহার নিজের নয়; তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ বা অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য কার্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই চরম লক্ষে যাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই সেই চরম লক্ষ। সাংখ্য দর্শনের মতে এরূপ আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্ত সংখ্য আত্মা রহিয়াছেন। সাংখ্যের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে ঈশ্বর নাই—জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এখন আমাদিগকে সাংখ্যদের এই তিনটি মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটি এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু তাহা আত্মার নয়, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নির্গুণ ও অরূপ। সাংখ্যের যে দ্বিতীয় মত আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই; বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের কোনপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র এক আত্মা আছেন, এবং সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন।

প্রথমে আমরা সাংখ্যের প্রথম সিদ্ধান্তটি লইয়া আলোচনা করিব যে, বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মাতে ওগুলি নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ সসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তবর আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, তাঁহারা যাহাকে বুদ্ধিজাত জ্ঞান বলেন, তাহা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বিষয়ানুভূতি কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটি আলোচনা

করা যাক। আমাদের স্মরণ আছে যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বস্তুকে লইতেছে, উহারই উপর বহির্বিষয়ের আঘাত আসিয়াছে এবং উহা হইতে প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন বাহিরে কোন বস্তু রহিয়াছে; আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপে হইতেছে? বোর্ডটির স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহা জানিতে পারি না। জার্মান দার্শনিকেরা উহাকে 'বস্তুর স্বরূপ' ( Thing of itself) বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা 'ক' আমার চিত্তের উপর কার্য করিতেছে, আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটি হ্রদের মতো। যদি হ্রদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদরে উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতি-ক্রিয়া-রূপ একটি তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষয়ানুভূতি-কালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটি দেখিয়া থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটি মোটেই সেই প্রস্তরটির মতো নয়—উহা একটি তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'-ই প্রস্তররূপে মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক'-স্বরূপ; আপনি আমার মনের উপর কার্য করিতেছেন, এবং যেদিক হইতে ঐ কার্য হইয়াছিল, তাহার মন একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা 'অমুক নর' বা ' অমুক নারী' বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটি উপাদান—একটি ভিতর হইতে ও অপরটি বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটির মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কতকক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটি বালুকাকণা১ ঐ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি বালুকাকণার চতুর্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুইটি জিনিসে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ শুক্তির শরীর নিসৃঃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ বর্হিদেশ হইতে প্রাপ্ত আঘাত। আমার

এই টেবিলটির জ্ঞানও সেইরূপ– 'ক'+মন। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তো মনই করিবে, আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা হইয়া দাঁড়াইল একটি যৌগিক পদার্থ 'ক'+মন। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে জানিতে ইচ্ছা করি, তখন ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও আজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে 'খ' বলা যাক। যখন আমি আমাকে শ্রীঅমুক বলিয়া জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' 'খ+মন' এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' মনের উপর একটি আঘাত করে, মনও আবার ঐ ' খ' - এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতে জ্ঞানকে 'ক+মন'(বাহ্যজগৎ) এবং 'খ+মন' (অন্তর্জগৎ) রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'ক ও খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক–বাহ্যজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক, এবং বুদ্ধি বা অহংজ্ঞানও সেরূপ একটি যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ+মন', আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক+মন'। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান ' খ' এর সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক' এর সহিত মনের সংযোগের ফল। প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটি গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান 'খ' ও মনের সংযোগলব্ধ, আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপে আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক'-এর সংযোগে উৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমি আছি, আমি জানিতেছি ও আমি সুখী অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের ভাব আসে যে, আমার কোন অভাব নাই-এই তিনটি তত্ত্বে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপর বস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটি তত্ত্বই ব্যাবহারিক সত্তা,

ব্যাবহারিক জ্ঞান, ব্যাবহারিক আনন্দ বা প্রেমরুপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ, উদ্ভিদগণ ও নিম্নতম হইতে উচ্চতম সত্তা পর্যন্ত সকলকেই ভালবাসিয়া থকি। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই তাহারা সকলেই জগতে থাকিবে, তাহারা সকলকেই জানিবে এবং সকলকেই ভালবাসিবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা জানিতেছি, তাহা পূর্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল, আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল, আর প্রেমও ঐ 'খ' ও মনের সংযোগফল। অতএব এই যে তিনটি বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যাবহারিক সত্তা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা(সৎ), পারমার্থিক জ্ঞান(চিৎ) ও পারমার্থিক আনন্দ বলিয়া থাকেন।

সেই পারমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম অমিশ্র অযৌগিক, যাহার কোন পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা, আর তখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া যেন মলিন হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা মানব নামে অভিহিত করি। উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উদ্ভিদ্‌জীবন, পশুজীবন, বা মানবজীবনরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন অনন্ত দেশ এই গৃহের দেওয়াল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনের দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই পারমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না–বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রতিভ জ্ঞান বলি, যখন আরও অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। উহাকে 'সর্বজ্ঞতা' বলিলে উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নয়। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ আনন্দ সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা 'প্রেম' বলি–

যাহা স্থূল শরীর, সূক্ষ্মশরীর বা ভাবসমূহের প্রতি আকর্ষণ স্বরূপ। এইগুলি সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশমাত্র আর ঐ আনন্দে আত্মার গুণবিশেষ নয়, উহা আত্মার স্বরূপ—উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নয়, উহারা আত্মার স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটি একই জিনিস, আমরা এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিযা থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিম্বে প্রকৃতিকে চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব মনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচার বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মাধ্যমের ভিতর দিয়া উহা প্রকাশ পায় তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এজন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অতি সূক্ষ্মতর ও জ্ঞানপ্রকাশে উপযোগী, সেজন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা একখণ্ড কাঁচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও এইরূপ; আমরা যে অস্তিত্বকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্ব সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্বমাত্র, এই নিরপেক্ষ সত্তাই আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ; যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ যেমন ব্যক্তভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অতি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত স্বাভাবিক স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসিলাম তারপরদিনই আমি আপনাকে আর ভালবাসিতে নাও পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তারপরদিন আবার কমিয়া গেল, কারণ উহা একটি সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম, তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন—উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ, আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে মহত্তর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে

অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অত্যন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম মরণের কথা ভাবিতে পারা যায় না, কারণ তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ। কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে মতভেদ—তাহার ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টিবুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টিশরীর পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশ-শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও স্বরূপ আত্মাকে স্বীকার করা পয়োজন, সমষ্টিতেও—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তারূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাস করিব। এই সমষ্টিবুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ এক সর্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা অস্বীকার করি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন—তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার কথা জানিতে পারিব। যদি আমরা একটি মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগতকে বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ সবই একই নিয়মে নির্মিত অতএব ইহা যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টিশ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন অছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি পরূষ, যিনি কোন উপাদানে নির্মিত নন, তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটি চৈতন্যকে স্বীকার প্রয়োজন হইবে। যে সর্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশাতে রহিয়াছে, বেদান্ত তাহাকে সকলের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর' বলেন।

এখন পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় অপেক্ষা গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে, আত্মা একটি মাত্র থাকিতে পারেন। যেহেতু আত্মা কোন প্রকার বস্তু দ্বারা গঠিত নয়, সেই হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে—সাংখ্যের এই মত প্রমাণ করিয়া বিবাদের প্রারম্ভেই আমরা উহা দিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছু দ্বারা সীমিত। এই টেবিল রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব হইতে এমন একটি বস্তুর কল্পনা করিতে হয় যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ'

সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে উহাকে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বাহিরে আরও দেশ রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটিই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কোনটিই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা কাল সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দিষ্ট একটি 'কালের অতীত কাল' সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটি সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটি অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন– উহাকে অসীম হইতে পৃথক করা অসম্ভব। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতে প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্বব্যাপী। এখন একটি গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি দুইটি হইতে পারে? মনে করুন অসীম পদার্থ দুইটি হইল– তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটি অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' কে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ আপনি ইহা বলিতে পারেন যে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নয়, আবার অনন্ত 'খ' এর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে উহা অনন্ত 'ক' নয়। অতএব অনন্ত একটিই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাবে ভাগ করা যাক না কেন, তথাপি উহা অনন্ত হইবে, কারণ উহাকে স্বরূপ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না। মনে করুন, একটি অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে আপনি কি এক ফোঁটা জলও লইতে পারেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

---

১ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি–এই লোক-প্রচলিত বিশ্বাসটির কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকীটাণুবিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

---

কিন্তু আত্মা যে এক, ইহা অপেক্ষাও তাহার প্রবলতর প্রমাণ আছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা—ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্বকথিত 'ক' ও 'খ' নামক অজ্ঞাতবস্তুসূচক চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যাহাকে আমরা বর্হিজগৎ বলি, তাহা 'ক+মন', এবং অন্তর্জগৎ 'খ+মন'। 'ক' ও 'খ' এই দুইটিই অজ্ঞাত পরিমাণ বস্তু—দুইটি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এখন দেখা যাক্, মন কি? দেশ, কাল, নিমিত্ত ছাড়া মন আর কিছুই নয়—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না এবং নিমিত্ত বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্বোক্ত 'ক'ও'খ' এই তিনটি ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঐগুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নয়। এখন ঐ তিনটি ছাঁচ, যাহাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, সেগুলি তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। 'ক'ও'খ' এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই ম—-এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল। 'ক'ও'খ' উভয়ই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়। আমরা উহাদিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ-বা বিশেষণ-রহিত বলিয়া উভয়ই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ ও পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটি হিতে পারে না। সেখানে কোন গুণ নাই, সেখানেই কেবল এক বস্তু থাকিতে পারে। ' ক' ও' খ' উভয়ই নির্গুণ, কারণ উহারা মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই ' ক' ও' খ' এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে; আর এক সত্তা যখন দেশ কাল নিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম-ভূত, স্থূল-ভূত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু—কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। যখন উহার একটি অংশ এই দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে পড়ে, তখন উহা আকার গ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়; ঐ জাল সরাইয়া দেখুন—সবই এক। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ. আর উহাকেই অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে 'ব্রহ্ম' বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে আছেন বলিয়া প্রতীত হয়, তখন তাহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন তিনি

এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে 'আত্মা' বলে। অতএব এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটি মাত্র পুরুষ আছেন—তাহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন বুঝা যায়—উভয়ই এক। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনি স্বয়ং, অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। 'সকল হস্তে আপনি কাজ করিতেছেন, সকল মুখে আপনি খাইতেছেন, সকল নাসিকায় আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।'১ সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় জগৎ; আপনি জগতের আত্মা, আবার আপনিই উহার শরীর বটে। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনিই মানুষ, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎ আপনিই। যাহা কিছু আছে সবই 'আপনি'; যথার্থ 'আপনি' যাহা—সেই এক অবিভক্ত আত্মা; যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তি বিশেষকে আপনি আমি বলিয়া মনে করেন, তাহা নয়।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিবাবে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন?—কিভাবে শ্রী অমুক, পশুপক্ষী বা অন্যান্য বস্তু হইলেন? ইহার উত্তরঃ এই সমুদয় বিভাগই আপাতপ্রতীয়মান। আমরা জানি অনন্তের কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র—এ কথা মিথ্যা, উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে শ্রী অমুক—এ-কথাও কোনকালে সত্য নয়, উহা কেবল সপ্নমাত্র। এটি জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

'আমি মনও নই, দেহও নই, ইন্দ্রিয়ও নই—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমি সেই, আমিই সেই।' ২

ইহাই জ্ঞান এবং ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান। যাহা কিছু আছে, সবই অজ্ঞান—অজ্ঞানের ফলস্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন লাভ করিব কি? আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ আমিই জীবনস্বরূপ সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নয়, যাহা

আমাতে নাই এবং যাহা আমার স্বরূপে অবস্থিত নয়। আমিই পঞ্চভূত-রূপে প্রকাশিত; কিন্তু আমি এক ও মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন তো বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তির জ্ঞান, এবং মুক্তিই সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য।

———

১ গীতা, ১৩। ১৩

২ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমি র্ন বায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ।।
—নির্বাণষটকম্, শংকরাচার্য

# ৫. মুক্ত আত্মা

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্যবসিত—উহার সিদ্ধান্ত, এই যে চরমতত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মাসমূহ। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেজন্য উহার বিনাশ নাই, সুতরাং উহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উহা অমিশ্র, আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি-সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চজাল বিস্তার করেন, আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নন, তখনই তাহার মুক্তি। অপরদিকে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী। আত্মা যখন অশ্রিত পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না; কারণ সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব দেশ কাল বা নিমিত্তের মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাহাকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে, আর তাহার অর্থ—উহার একটি দেহ অবশ্যই থাকিবে; আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে তো আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার; আর যাহা নিরাকার তাহা এখান সেখানে বা অন্য কোন স্থানে আছে এ কথা বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। সাংখ্যদর্শন ইহার উপর আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তিরা প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। যদি প্রকৃতি একটি অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটি অমিশ্র বস্তু হইল, আর যে সকল যুক্তিতে আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে মুশকিল হয় এই যে, দুইটি অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব।

এ বিষয়ে বেদান্তীদের সিদ্ধান্ত কি? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে

পারে এবং প্রকৃতি কার্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে উহদের পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন, তাহাকে আমরা 'ঈশ্বর' বলি, সুতরাং এই জগৎ তাহা হইতে পৃথক নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিত্তকারণ নন, উপাদানকারণও বটে। কারণ কখনও কার্য হইতে পৃথক নয়। কার্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা তো আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব ইনিই প্রকৃতির কারনস্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত-বেদান্তের যত বিভিন্ন মত বা বিভাগ আছে, সকলেরই এই প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্তকারণ নন, তিনি ইহার উপাদান কারণও বটে; যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান—এই আত্মাগণও ঈশ্বরের অংশ, সেই অনন্ত বহ্নির এক একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। অর্থাৎ যেমন একটি বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে।১

এই পর্যন্ত তো বেশ হইল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—এ কথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা, তাহা তো অবিভাজ্য। অনন্তের কোন অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখনও বিভক্ত হইতে পারে না। তবে যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইয়াছে—এ কথার তাৎপর্য কি? অদ্বৈতবেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক আত্মা তাহার অংশ নন, প্রত্যেকে প্রকৃতপক্ষে সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাইতেছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্যের মূর্তি রহিয়াছে। এইরূপে এই সকল আত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র, সত্য নয়। তাহারা প্রকৃতপক্ষে সেই 'আমি' নয়, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এই অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি প্রতিবিম্ব মাত্র, সত্য নয়। উহারা প্রকৃতির উপর প্রতীত মায়াময় প্রতিবিম্ব মাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষ 'আপনি', 'আমি' ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদপ্রতীতি মিথ্যা বই আর কিছুই নয়।

তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাতে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাইতে এই আপাতপ্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাহাকে জড়জগৎ বলিয়া দেখি; যখন আর একটি উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়াই তাহাকে দেখি, তখন তাহাকে পশুপক্ষী রূপে দেখি; আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে, আরও উচ্চে যাইলে দেবরূপে দেখিয়া থাকি। তথাপি ঈশ্বর জগদব্রহ্মাণ্ডের এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও সেই, আপনিও সেই–তাঁহার অংশ নয়, পূর্ণই। তিনি অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চস্বরূপ। তিনি বিষয় ও বিষয়ী–উভয়ই। তিনিই 'আমি' তিনিই 'তুমি'। ইহা কিরূপে হইল?

------

১ যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফু লিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।–মুণ্ডকোপনিষদৎ, ২। ১। ১

------

এই বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে বুঝানো যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে?১ জ্ঞাতা কখনও নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা–তিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু–তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরশি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না, সেরূপ আত্মাও প্রতিবিম্ব না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাস্বরূপ। আদি প্রাণকোষ (Protoplasm) তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্ব-গ্রাহক হইতে সর্বোত্তম প্রতিবিম্ব-গ্রাহক–পূর্ণ মানবের প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটি ক্ষুদ্র কর্দমাবিল জলপল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা বাহ্য

সীমারেখা দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্মল জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তরপর উজ্জল ধাতুতে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিল। শেষে একখানি আরশি লইয়া তাহাতে মুখ দেখিল—তখন সে নিজেকে যথাযথ ভাবে প্রতিবিম্ব দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়-স্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ট প্রতিবিম্ব—'পূর্ণ মানব'। আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব সহজ প্রেরণায় কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণমানবগণ কেন স্বভাবতই ঈশ্বর রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাই বলুন না কেন, ইহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এজন্যই লোকে খ্রীষ্ট-বুদ্ধাদি অবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্বরূপ। আপনি বা আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধারণা করি না কেন, ইহারা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর। একজন পূর্ণমানব এই সকল ধারণা হইতে অনেক উচ্চে। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়; পরিবর্তে তাহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকাল সেই পূর্ণ পুরুষই রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল? এই পূর্ণপুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ-স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি কোন কালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানাবর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্তকাল সেখানে থাকিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বারাবর সমভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন পরিবর্তন হয় নাই, মেঘেরই কেবল পরিবর্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব হইতে পূর্ণস্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণই আছেন। কিছুই আপনাদের প্রকৃতিকে কখন পরিবর্তিত করিতে পারে না, কখন করিবেও না। আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এইসব ধারণা ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোন কালে দেহ ছিল না, আপনি কোনকালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—এই সূর্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ্, আমাদের এই জগতের প্রত্যেক অংশের মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ

তাহাদের প্রভাব বিকিরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পরকে ভালবাসিতেছে এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনি সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনি সর্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? আপনিই সর্বেসর্বা। এই জ্ঞানের উদয় হইলে মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।

---

১ বিজ্ঞতারমরে কেন বিজ্ঞনীয়াৎ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪। ৫। ১৫

---

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম; এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ—অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি তেমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল—সারা জীবন ধরিয়া যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এ সেই মরিচীকা। তখন আমি আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম, গত এক মাস ধরিয়া যে সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম, ঐগুলি মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জ্ঞান আসিল যে, উহা মরিচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারায় উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে এই জগদ্‌ভ্রান্তি একদিন ঘুচিয়া যাইবে। এই-সকল ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহারই নাম প্রত্যক্ষানুভূতি। ‘দর্শন’ কেবল কথার কথা বা তামাশা নয়; ইহাই প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর যাইবে, এই পৃথিবী এবং আর যাহ কিছু সবই যাইবে— আমি দেহ বা আমি মন, এই বোধ কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে, অথবা যদি কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া থাকে, তবে একেবারে

চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেরূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিবে। এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী—সবই আবার আসিবে, যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি ঐগুলির স্বরূপ জানিয়াছি। তখন ঐগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোন দুঃখকর বিষয় আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে—আমি জানি তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবন্মুক্ত-অর্থে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য—এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি, এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলজ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, সেরূপ তিনি জগতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুধু তাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সেই পূর্ণস্বরূপের সহিত অভেদভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে, ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনি জানিবেন যে, আপনিই তিনি, তাঁহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাহার সবটুকুই আপনি, তখন সকল ভয় দূর হইয়া যায়। 'সেখানে কে কাহাকে দেখে? কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার কথা শুনে? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে কথা বলে, একজন অপরের কথা শুনে, উহা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকেও দেখে না, কেহ কাহাকেও বলে না, তাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম।' ১ আপনিই তাহা এবং সর্বদাই তাহা আছেন। তখন জগতের কি হইবে? আমরা কি জগতের উপকার করিতে পারিব? এরূপ প্রশ্নই যেখানে উদিত হয় না। এ সেই শিশুর কথার মতো-বড় হইয়া গেলে আমার মিঠাইয়ের কি হইবে? বালকও বলিয়া থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্বেলের কি দশা

হইবে? তবে আমি বড় হইব না। ছোট শিশু বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির কি দশা হইবে? এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলিও সেরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এই তিন কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি—এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্ন মাত্র, উহাদের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ-দারিদ্র, পাপ পুণ্য কিছুই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের অস্তিত্বই না থাকে, তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? জ্ঞানযোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, সাহসপূর্বক ততদূর অগ্রসর হউন, এবং সাহসপূর্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞানলাভ করা বড়ই কঠিন। ইহা মহা সাহসীর কার্য। যে সব পুতুল ভাঙিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ যে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে—ইহা তাহারই কার্য।

———-

১ বৃহ. উপ., ৫।১৫ দ্রষ্টব্য

———-

এই শরীর আমি নই, ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী—ইহা তো উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার করিতে পারে। একজন লোক উঠিয়া বলিল, ‘আমি দেহ নই, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক।’ কিন্তু তাঁহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে তবে আর কোথায় আছে? সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র দেহ আসুক, যাক্—তাহাতে আমার কি?

‘আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, আমার মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই; কারণ তাহারা সকলেই আমি। (আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু ), আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমি সেই, আমিই সেই।’ ১

———-

১ ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।
–নির্বাণষটকম্,৫, শঙ্করাচার্য
–––––

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি উপবাস করি, আবার অন্য সহস্র দেহে প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, আবার সহস্র দেহে আমি সুখ ভোগ করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাই না, কাহাকেও ত্যাগ করি না; কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। আমিই আমার স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি; আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। ইহাই জ্ঞানীর ভাব–তিনি মহা সাহসী, অকুতভয়, নির্ভীক। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক না কেন, তিনি হাস্য করিয়া বলেন, উহার কখনও অস্তিত্বই ছিল না, উহা কেবল মায়া ও ভ্রমমাত্র। এইরূপে তিনি তাহার চক্ষের সমক্ষে জগদব্রহ্মাণ্ডকে যথার্থই অন্তর্হিত হইতে দেখেন, ও বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করেন, ‘এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায় বা মিলাইয়া গেল?’ ১

এই জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আর একটি আশঙ্কার আলোচনা ও তৎ সমাধানের চেষ্টা করিব। এ পর্যন্ত যাহা বিচার করা হইল, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের সীমা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত করে যে, একমাত্র সত্তাই বর্তমান, আর সমুদয় কিছুই নয়, ততক্ষণ তাহার থামিবার উপায় নাই। যুক্তিপরায়ণ মানব জাতির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত-অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই : যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি এই সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নই জগতের সর্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে? সাধারণ চলিত কথায় প্রশ্নটি এই ভাবে করা হয় : এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল? ইহাই প্রশ্নটির চলিত ও

ব্যাবহারিক রূপ, আর অপরটি অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ। কিন্তু উত্তর একই। নানা স্তর হইতে নানাভাবে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নতরভাবে উপস্থাপিত হইলে প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় না ;

---

১ ক্ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।—বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৫

---

কারণ আপেল, সাপ ও নারীর গল্পে ১ এই তত্ত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। ঐ অবস্থায় প্রশ্নটিও যেমন বালকোচিত, উহার উত্তরও তেমনি। কিন্তু বেদান্তে এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভ্রম কিরূপে আসিল? আর উত্তরও সেইরূপ গভীর। উত্তরটি এই : অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আশা করিও না। ঐ প্রশ্নটির অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটিই অসম্ভব। কেন ? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহা দেশ কাল নিমিত্তের অতীত, তাহাই পূর্ণ। তারপর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ণ কি রূপে অপূর্ণ হইল? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে দাঁড়ায়—'যে বস্তু কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্যরূপে পরিণত হয়। এখানে তো আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তারপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহা কিরূপে কার্যে পরিণত হয়? কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সীমার ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্যন্ত দেশ কাল নিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অতীত বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক; কারণ প্রশ্নটি যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশ কাল নিমিত্তের গণ্ডির ভিতরে কোনকালে উহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে কি উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা সেখানে গেলেই জানা যাইতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না। যখন লোকে পীড়িত হয়, তখন 'কিরূপে ঐ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রথমে জানিতে

হইবে'—এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারিয়া যায়, তাহারই জন্য প্রাণপণ যত্ন করে।

এই প্রশ্ন আর একটি আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা একটু নিম্নস্তরের কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ আছে এবং ইহাতে তত্ত্ব অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটি এই : এই ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? কোন সত্য কি কখনও ভ্রম জন্মাইতে পারে? কখনই নয়। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। সেটি আবার একটি ভ্রম জন্মায়, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগ হইতেই রোগ জন্মায়, স্বাস্থ্য হইতে কখন রোগ জন্মায় না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই-কার্য কারণেই আর এক রূপমাত্র। কার্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? আবশ্য আর একটি ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটি মাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিবে : ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ আপনি জগতে দুইটি সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটি আপনি আর একটি ঐ ভ্রম। ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নয়। স্বপ্ন আসে, আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটি সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথামাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এখন জিজ্ঞসা করা যাইতে পারে, এই যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে?- এগুলি সবই থাকিবে। এসব কেবল আলোর জন্য অন্ধকারে হাতড়ানো, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা নিজেকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহার বাহিরে; এই জালের মধ্যে দাসত্ব, ইহার সবকিছুই নিয়মাধীন। উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর,

ততদূর পর্যন্ত নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যে পর্যন্ত আপনি দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, সে পর্যন্ত আপনি মুক্ত—এ কথা বলা নিরর্থক। কারণ ঐ জালের মধ্যে সবই কঠোর নিয়মে—কার্য কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে-কোন চিন্তা করেন, তাহা পূর্ব কারণের কার্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য-রূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশমাত্র, সুতরাং 'স্বাধীন ইচ্ছা' বাক্যটির কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্বন্ধে এই সকল বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

———

১ বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' আছে—ঈশ্বর যদি নর আদম ও আদি নারী ইভকে সৃজন করিয়া তাহাদিগকে ইডেন নামক সুরম্য উদ্দানে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে ইভকে প্রলোভিত করিয়া তৎপর তাহার দ্বারা আদমকে ঐ বৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের ভালমন্দ-জ্ঞান উপস্থিত হইয়া পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।

———

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় মনে কার্যে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মতো বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন—এই উভয়ই কঠোর কার্য কারণ নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যতদিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতই তীক্ষ্নবুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তুই যে স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল মানুষ যতই স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলেই বাধ্য হইয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাজ করা সম্ভব নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা

যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয়া নির্মল নীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার চকিতদর্শন-মাত্র, আর নীলাকাশরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তস্বভাব আত্মা উহার বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ভ্রমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই অর্থহীন সংসারে, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ-সমন্বিত এই বিশ্বজগতে থাকিতে পারে না। এই-সকল অনাদি অনন্ত স্বপ্ন—যেগুলি আমাদের বশে নাই, যেগুলিকে বশে আনাও যায় না, যেগুলি অযথা সন্নিবেশিত, ভগ্ন ও আসামঞ্জস্যময়—সেই-সব স্বপ্নকে লইয়া আমাদের এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটি দৈত্য আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে অসংলগ্ন মনে করেন না। আপনি মনে করেন, এ তো ঠিকই হইতেছে। আমরা যাহাকে নিয়ম বলি তাহাও এইরূপ। যাহা কিছু আপনি নিয়ম বলিয়া নির্দিষ্ট করেন, তাহা আকস্মিক ঘটনামাত্র, উহার কোন অর্থ নাই। এই স্বপ্নাবস্থায় আপনি উহাকে নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। মায়ার ভিতর যতদূর পর্যন্ত দেশ কাল নিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্যন্ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই, আর এই বিভিন্ন উপাসনা প্রণালী এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বরের ধারণা এবং পশু ও মানবের ধারণা—সবই এই মায়ার মধ্যে, সুতরাং সবই সমভাবে ভ্রমাত্মক, সবই স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা কতকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্‌গজ দেখিতে পাই। আপনারা যেন তাঁহাদের মতো তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর ধারণা ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের ধারণা সত্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধারণা একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই কেবল যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহজগৎ পরজগৎ উভয়ই আস্বীকার করেন। উভয়টিই এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সেই মায়ার রাজত্ব। এইপ্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নাস্তিক সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করে, তাহার নিজ দেহ এবং মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান করা উচিৎ। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ও মন উড়িয়া যায়, আর যখন উভয়ই লোপ পায়, তখনই যাহা যথার্থ সত্তা, তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়।

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নয়। আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না বা জানিতেও পারি না।' ১

ইহার তাৎপর্য আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যতদূর বাক্য, চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত মায়ার আধিকার, ততদূর পর্যন্ত বন্ধনের ভিতর। সত্য উহাদের বাহিরে। সেখানে চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পৌঁছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত বিচারের দ্বারা তো বেশ বুঝা গেল, কিন্তু এইবার সাধনের কথা আসিতেছে। এইসব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব উপলব্ধির জন্য কোন প্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি?—নিশ্চয়ই আছে। সাধনার দ্বারা যা আপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে তাহা নয়, আপনারা তো পূর্ব হইতেই 'ব্রহ্ম' আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, এ কথা সত্য নয়। আপনারা সর্বদা পূর্ণস্বরূপই আছেন, আর যখনই মনে করেন—আপনারা পূর্ণ নন, সে তো একটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদের বোধ হইতেছে, আমুক পুরুষ, আমুক নারী তাহা আর একটি ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে, আর সাধন বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম। আগুণ আগুণকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা অপর একটি ভ্রম নাস করিবার জন্য অপর একটি ভ্রমের সাহায্য নিতে পারেন। একখণ্ড মেঘ আসিয়া অপর এই মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়ই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুলি কি? আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব তাহা নয়; আমরা সর্বদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম; আমরা সুখী বা আমরা অসুখী—এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটিকে সরাইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানেরা শিয়ালকে অতিশয় পবিত্র মনে করিয়া থাকে, হিন্দুরাও তেমনি কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শিয়াল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার উপায় নাই। কোন মুসলমানের বাটিতে একটি শিয়াল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য খাইয়া পালাইল। লোকটি বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল, আর সেই ভোজ্যদ্রব্যগুলি

শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল! আর তাহার খাইবার উপায় নাই। কাজে কাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল, 'সাহেব' গরিবের এক নিবেদন শুনুন। একটি শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুখাদ্য সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। একটা শিয়াল আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন। মোল্লা মুহূর্তের জন্য একটু ভাবিলেন, তারপর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া গিয়াছে, সেই থালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো। এখন কুকুর শিয়ালের নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, এ দুই উচ্ছিষ্ট পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।' আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটি ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটি ভ্রমের সাহায্য লইলাম—পূর্ণতা লাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে। তখন একটি ভ্রম আর একটি ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটি কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটি কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে একবার 'তত্ত্বমসি' শুনিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায়, আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়।

প্রথম প্রশ্ন এই : জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা? যাহাদের নিম্নলিখিত সাধন-সম্পত্তিগুলি আছেল। প্রথমতঃ 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ'—এই জীবনে বা পরজীবনে সর্বপ্রকার কর্মফল ও সর্বপ্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন। কেবল কাহারও শীঘ্র, কাহারও বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়; অপরের পক্ষে অতীত সংস্কার সমষ্টি তাহাদের বাসনাপুর্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগবাসনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ

স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম, পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে-ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ জীবন মৃত্যুরই নামান্তরমাত্র। আপনি যে জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক মাত্রল সুখ এই ভ্রমের এক দিক, দুঃখ আর একটা দিক। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ-সকলই তো মনের সৃষ্টিমাত্র। ইহাকে 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' বলে।

তারপর 'শম' বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না।

------

১ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।–কেন উপ, ১। ৩

------

মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে–কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সাহায্য লন না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি–এই সকল সাধনেই বিশ্বাসী।

তারপর 'তিতিক্ষা' –কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্বদুঃখসহন। যখন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাড়াইয়া থাকুন। পালাইবে কে? অনেক লোক আছেন যাহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য হন। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন, আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাহারা এসকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেকে হিমালয়ের তুষাররাশির মধ্যে বসিয়া থাকে, কোনপ্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি? শীতই বা কি? এ-সকল আসুক যাক–আমার তাহাতে কি? 'আমি' তো শরীর নই। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু লোকে যে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল।

যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও সেরূপ তাঁহাদের দর্শন-অনুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে এবং তদনুসারে কার্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। 'আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—সোঽহং, সোঽহম্।' দৈনন্দিন কর্মজীবনের বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ—কর্মজীবনে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম কেবল ভুয়া কথা মাত্র নয়। কিন্তু এই জীবনেই ধর্মের সর্বাঙ্গ স্বপ্নরূপে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা—কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করা। আমি নিজে এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন 'আমি আত্মা-আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি? সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, শীতল-উষ্ণ—এ-সকল আমার পক্ষে কিছুই নয়।' ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগসুখের জন্য ধাবমান হওয়া নয়। ধর্ম কি—ধর্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা, 'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও'? ধর্ম সম্বন্ধে এ-সকল আহাম্মকি ধারণা! যাহারা ধর্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। আমার গুরুদেব বলিতেন, 'চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গো-ভাগাড়ে।' যাহা হউক, আপনাদের ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি?—রাস্তা সাফ করা, আর ভাল অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লোক আসিতেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে- কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ-দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, ঐ-সকলের বাইরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাইরে চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। 'আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ সৎ-চিৎ—আনন্দ সোঽহং, সোঽহম্।'

# ৬. বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা

আমরা দেখিয়াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাগই এই সকল বিভিন্ন যোগপথের সন্ধিস্থল। কর্মী কর্মফল ত্যাগ করেন। ভক্ত সেই সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী প্রেমস্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেন; যোগী যাহাতে কিছু অনুভব করেন, তাঁহার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা—সব পরিত্যাগ করেন, কারণ তাহার যোগশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, সমগ্র প্রকৃতি যদিও আত্মার ভোগ ও আভিজ্ঞতার জন্য, তথাপি উহা শেষে তাঁহাকে জানাইয়া দেয় তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত নন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য-স্বতন্ত্র। জ্ঞানী সব ত্যাগ করেন, কারণ জ্ঞান শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোনকালেই প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, এই-সকল উচ্চতর বিষয়ে এ প্রশ্ন করা যাইতে পারে না : ইহাতে কি লাভ? লাভালাভের প্রশ্ন-জিজ্ঞসা করাই এখানে অসম্ভব, আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলেও আমরা উহা উত্তমরুপে বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই?—যাহা মানুষের সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে না, তাহার সুখ বৃদ্ধি করে না, তাহা অপেক্ষা যাহাতে তাহারা বেশী সুখ, তাহারা বেশী লাভ—বেশী হিত তাহাই সুখের আদর্শ। সমুদয় বিজ্ঞান ঐ এক লক্ষ্যসাধনে অর্থাৎ মনুষ্যজাতিকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, আর যাহা বেশী পরিমাণ সুখ আনে, মানুষ তাহাই গ্রহণ করে; যাহাতে অল্প সুখ, তাহা ত্যাগ করে। আমরা দেখিয়াছি সুখ হয় দেহে, না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষ্যগণের সকল সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর বা ব্যাঘ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। সুতরাং কুকুর ও ব্যাঘ্রের সুখের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মানুষের ভিতর আমরা একটা উচ্চস্তরের চিন্তাগত সুখ দেখিয়া থাকি—মানুষ জ্ঞানালোচনায় সুখী হয়। সর্বোচ্চ স্তরের সুখ জ্ঞানীর—তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। আত্মাই তাহার সুখের একমাত্র উপকরণ। অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্মজ্ঞানই পরম লাভ বা হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম সুখ পাইয়া থাকেন। জড়বিষয়সমূহ বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা তাহার নিকট সর্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানে যেরূপ সুখ পাইয়া থাকেন, উহাতে সেরূপ পান না।

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই সকলের একমাত্র লক্ষ, আর আমরা যত প্রকার সুখের বিষয় আবগত আছি, তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্বোচ্চ সুখ। 'যাহারা অজ্ঞানে কাজ করিয়া থাকে, তাহারা যেন দেবগণের ভারবাহী পশু' –এখানে দেব অর্থে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি যন্ত্রবৎ কার্য ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবনটাকে উপভোগ করে না, বিজ্ঞ ব্যক্তিই জীবনটাকে উপভোগ করেন। একজন বড় লোক হয়তো এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একখানি ছবি কিনিল, কিন্তু যে শিল্প বুঝিতে পারে, সেই উহা উপভোগ করিবে। ক্রেতা যদি শিল্পজ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা নিরর্থক, সে কেবল উহার আধিকারি মাত্র। সমগ্র জগতে বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিই কেবল সংসারে সুখ উপভোগ করেন। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনও সুখভোগ করিতে পারে না, তাহাকে অজ্ঞাতসারে অপরের জন্যই পরিশ্রম করিতে হয়।

এ পর্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ দেখিলাম, দেখিলাম তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, দুই আত্মা থাকিতে পারে না। আমরা দেখিলাম–সমগ্র জগতে একটি মাত্র সত্তা বিদ্যমান, আর সেই এক সত্তা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে উহাকেই এই জড়জগৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন কেবল মনের ভিতর দিয়া উহা দৃষ্ট হয় তখন উহাকে চিন্তা বা ও ভাবজগৎ বলে, আর যখন উহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন উহা এক অনন্ত পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই বিষয়টি আপনারা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন– ইহা বলা ঠিক নয় যে, মানুষের ভিতর একটি আত্মা আছে, যদিও বুঝাইবার জন্য প্রথমে আমাকে ঐরূপ ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে কেবল এক সত্তা রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আত্মা–আর তাহাই যখন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ বলে; যখন উহা চিন্তা বা ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন বলে; আর যখন উহা স্ব-রূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা আত্মারূপে–সেই এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা ঠিক নয় যে, দেহ, মন ও আত্মা–একত্র এই তিনটি জিনিস রহিয়াছে, যদিও বুঝাইবার সময় ঐরূপে ব্যাখ্যা করায় বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল; কিন্তু সবই সেই আত্মা, আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে কখন দেহ, কখন মন, কখন বা আত্মারূপে কথিত হয়। একমাত্র পুরুষই আছেন, অজ্ঞানীরা

তাঁহাকেই জগৎ বলিয়া থাকে। যখন সেই ব্যক্তিই জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তখন সে সেই পুরুষকেই ভাবজগৎ বলিয়া থাকে। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে সকল ভ্রম দূর হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায়, এ সবই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নয়। চরম সিদ্ধান্ত এই যে, 'আমি সেই এক সত্তা'। জগতে দুইটি বা তিনটি সত্তা নাই, সবই এক। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। সেই দড়িটাই সাপ বলিয়া দৃষ্ট হয়। এখানে দড়ি আলাদা ও সাপ আলাদা—এরূপ দুইটি পৃথক্ বস্তু নাই। কেহই সেখানে দুইটি বস্তু দেখে না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ অনুভূতির সময় আমরা একই সময়ে সত্য ও মিথ্যা কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলেই জন্ম হইতে একত্ববাদী, উহা হইতে পালাইবার উপায় নাই। আমরা সকল সময়েই 'এক' দেখিয়া থাকি। যখন আমরা রজ্জু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না; আবার যখন সর্প দেখি, তখন মোটেই রজ্জু দেখি না—উহা তখন উড়িয়া যায়। যখন আপনাদের ভ্রম হয়, তখন আপনারা যথার্থ বস্তু দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছেন। আপনি তাহাকে অতি ভালভাবেই জানেন, কিন্তু আপনার সম্মুখে কুজ্ঝটিকা থাকায় আপনি তাহাকে অন্য লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে দেখিতেছেন না, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে দেখিতেছেন। মনে করুন আপনার বন্ধুকে 'ক' বলিয়া অভিহিত করা গেল। তাহা হইলে আপনি যখন 'ক' কে 'খ' বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 'ক'কে মোটেই দেখিতেছেন না। এইরূপ সকল স্থলে আপনদের একেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন আপনি নিজেকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন আপনি দেহমাত্র, আর কিছুই নন, আর জগতের অধিকাংশ মানুষেরই এইরূপ উপলব্ধি। তাহারা মুখে আত্মা মন ইত্যাদি কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহারা অনুভব করে, এই স্থূল দেহ-স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ ইত্যাদি।

আবার কেহ কেহ কোন চেতন অবস্থায় নিজদিগকে চিন্তা বা ভাবরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। আপনারা অবশ্য স্যার হাম্ফ্রি ডেভি সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটি জানেন। তিনি তাহার

ক্লাসে 'হাস্যজনক বাষ্প' ( Laughing gas) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা নল ভাঙিয়া ঐ বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং তিনি নিঃশ্বাসযোগে উহা গ্রহণ করেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন, যখন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম, আমি বাস্তবিক অনুভব করিতেছিলাম যে, সমগ্র চিন্তা বা ভাবে গঠিত। ঐ বাষ্পের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল, আর যাহা পূর্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে চিন্তা বা ভাবরূপে দেখিতে পাইলেন। যখন অনুভূতি আরও উচ্চতর অবস্থায় যায়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করা যায়, তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-রূপে-সেই এক আত্মারূপে-বিরাট পুরুষরূপে দর্শন করি। 'জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকালে অনির্বচনীয়, নিত্যবোধ, কেবলানন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম, গগনসম, নিষ্ফল, নির্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন।' ১

অদ্বৈতমত এই বিভিন্ন প্রকার স্বর্গ ও নরকের এবং আমরা বিভিন্ন ধর্মে যে নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, এই সকলের কিরূপ ব্যাখ্যা করে? মানুষের মৃত্যু হইলে বলা হয় যে, সে স্বর্গে বা নরকে যায়, এখানে ওখানে নানা স্থানে যায়, অথবা স্বর্গে বা অন্য কোন লোকে দেহ ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে। এ-সমুদয়ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কেহই জন্মায় না বা মরে না; স্বর্গও নাই নরকও নাই অথবা ইহলোকও নাই; এই তিনটি কোন কালেই অস্তিত্ব নাই। একটা ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধ্যাবেলা বাহিরে যাইতে বলো। একটা 'স্থাণু' রহিয়াছে। বালক কি দেখে? সে দেখে একটা ভূত হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। মনে করুন, একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহা প্রণয়িনীর সহিত দেখা করিতে আসিতেছে—সে ঐ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডটিকে তাহার প্রণয়িনী মনে করে। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোর উহাকে পাহারাওয়ালা মনে করিবে। সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে। স্থাণুটিই সত্য, আর এই যে উহাকে বিভিন্নভাবে উহাকে দর্শন করা—তাহা নানা প্রকার মনের বিকারমাত্র। একজন পুরুষ এই আত্মাই আছেন। তিনি কোথাও যানও না, আসেনও না। অজ্ঞান মানুষ স্বর্গ বা সেরূপ

কোন স্থানে যাইবার বাসনা করে, সারাজীবন সে ক্রমাগত উহার চিন্তা করিয়াছে। এই পৃথিবীর স্বপ্ন—যখন তাহারা চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই স্বর্গরূপে দেখিতে পায়; দেখে এখানে দেব ও দেবদূতেরা বিচার করিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন তাহার পূর্বপুরুষদিগকে দেখিতে চায়, সে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ সে নিজেই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি কেহ আরও অধিক আজ্ঞান হয় এবং ধর্মান্ধেরা চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখায় তবে সে মৃত্যুর পর এই জগৎকেই নরক রূপে দর্শন করে, আর ইহাও দেখে যে, সেখানে লোকে নানাবিধ শাস্তিভোগ করিতেছে। মৃত্যু বা জন্মের আর কিছুই অর্থ নাই, কেবল দৃষ্টির পরিবর্তন। আপনি কোথাও যান না, বা যাহা কিছুর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেগুলিও কোথাও যায় না। আপনি তো নিত্য অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া আসা কি? ইহা অসম্ভব, আপনি তো সর্বব্যাপী। আকাশ কখন গতিশীল নয় কিন্তু উহার উপর মেঘ এদিক ওদিক যাইয়া থাকে- আমরা মনে করি, আকাশই গতিশীল হইয়াছে। রেলগাড়ি চড়িয়া যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও ঠিক সেরূপ। বাস্তবিক পৃথিবীতো নড়িতেছে না, রেলগাড়িই চলিতেছে। এইরূপে আপনি যেখানে ছিলেন সেইখানেই আছেন, কেবল এই সকল বিভিন্নস্বপ্ন মেঘগুলির মতো এতিক ওদিক যাইতেছে। একটা স্বপ্নের পর আর একটা স্বপ্ন আসিতেছে-ঐগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ ‘এলিসের অদ্ভুত দেশদর্শন’ (Alice in Wonderland) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। এই শতাব্দীতে শিশুদের জন্য লেখা একখানি আশ্চর্য পুস্তক। আমি ঐ বইখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম—আমার মাথায় বারবার ছোটদের জন্য ঐরূপ বই লেখার ইচ্ছা ছিল। এই পুস্তকে আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই ভাবটি যে, আপনারা যাহা সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে—কোনটির সহিত কোনটির কোন সম্বন্ধ নাই। একটা ভাব আসিয়া যেন আর একটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতেছে—পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। যখন আপনারা শিশু ছিলেন, তখন আপনারা ভাবিতেন—ঐগুলির মধ্যে অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। এই গ্রন্থাগার তাঁহার শৈশবাবস্থার চিন্তাগুলি—

শৈশবাবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত, সেগুলি লইয়া শিশুদের জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আর অনেকে ছোটদের জন্য যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি বড় হইলে তাহাদের যেসকল চিন্তা ও ভাব আসিয়াছে, সেই সব ভাব ছোটদের গিলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ বইগুলি তাহাদের কিছুমাত্র উপযোগী নয়—বাজে অনর্থক লেখা মাত্র। যাহা হউক, আমরা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুমাত্র। আমাদের জগৎও ঐরূপ অসম্বন্ধ—যেন ঐ এলিসের অদ্ভুত রাজ্য—কোনটির সহিত কোনটির কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কার্য কারণ নামে অভিহিত করি, আর বলি উহা আবার ঘটিবে। যখন এই স্বপ্ন চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে অন্য স্বপ্ন আসিবে, তাহাকেও ইহারই মতো সম্বন্ধযুক্ত বোধ হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় আমরা যাহা কিছু দেখি সবই সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নাবস্থায় আমরা সেগুলিকে কখনই অসম্বন্ধ বা অসঙ্গত মনে করি না—কেবল যখন জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে পাই। এইরূপ যখন আমরা এই জগদ্রূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন ঐ সমুদয়ই অসম্বন্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলি অসম্বন্ধ জিনিস যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল-কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে উহা শেষ হইবে। আর ইহাকেই 'মায়া' বলে। এই সমুদয় পরিমাণশীল বস্তু-রাশি রাশি সঞ্চরমান মেঘলোমতুল্য মেঘের ন্যায় এবং তাহার পশ্চাতে অপরিণামী সূর্য আপনি স্বয়ং। যখন সেই অপরিণামী সত্তাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন তাহাকে ঈশ্বর বলেন, আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পৃথক দেবতা বা ঈশ্বর নাই, আপনা অপেক্ষা-যথার্থ যে আপনি তাহা অপেক্ষা-মহত্তর দেবতা নাই; সকল দেবতাই আপনার তুলনাই ক্ষুদ্রতর; ঈশ্বর স্বর্গস্থ পিতা প্রভৃতি ধারণা আপনারই প্রতিবিম্ব মাত্র। স্বয়ং ঈশ্বর আপনর প্রতিবিম্ব বা প্রতিমাস্বরূপ। 'ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিবিম্বরূপে সৃষ্টি করিলেন' —এ কথা ভুল। মানুষ নিজ প্রতিবিম্ব আনুযায়ী ঈশ্বর বা দেবতা সৃষ্টি করিতেছে। আমরাই দেবতা সৃষ্টি করি, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহারই উপাসনা

করি, আর যখনই ঐ স্বপ্ন আমাদের নিকট আসে, তখন আমরা তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকি।

------

১ কিমপি সততোবোধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নিবিকল্পং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ।।
–বিবেকচূড়ামণি, ৪১০

------

এই বিষয়টি বুঝিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, আজ সকালের বক্তৃতার সার কথাটি এই যে, একটি সত্তা মাত্র আছে, আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন মধ্যবর্তী বস্তুর ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী স্বর্গ বা নরক, ঈশ্বর ভূতপ্রেত মানব বা দৈত্য, জগৎ বা এইসব যতকিছু বোধ হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাঁহারা কখন পরিণাম হয় না–যিনি এই চঞ্চল মর্ত্য জগতের একমাত্র জীবনস্বরূপ, যে পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়–আর কাহারও নয়। ১
সেই 'এক সত্তা'র সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে। কিরূপে তাহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে–কিরূপে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইবে, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। কিরূপে এই স্বপ্নভঙ্গ হইবে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারী–আমাদের ইহা চাই, ইহা করিতে হইবে, এই যে স্বপ্ন–ইহা হইতে আমরা কিরূপর জাগিব? আমরাই জগতের সেই অনন্ত পুরুষ আর আমরা জড়ভাবাপন্না হইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীরূপ ধারণ করিয়াছি–একজনের মিষ্ট কথায় গলিয়া যাইতেছি, আবার আর একজনের কড়া কথায় গরম হইয়া পড়িতেছি–ভালমন্দ সুখদুঃখ আমাদিগকে নাচাইতেছে! কি ভয়ানক পরনির্ভরতা, কি ভয়ানক দাসত্ব! আমি যে সকল সুখদুঃখের অতীত, সমগ্রই যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, সূর্য চন্দ্র তারা যাহারা মহাপ্রণের ক্ষুদ্র উৎসাহমাত্র–সেই আমি এইরূপ ভয়ানক দাসভাবাপন্ন রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একটি চিম্‌টি কাটিলে আমার ব্যাথা লাগে। কেহ যদি একটি মিষ্ট কথা বলে,

আমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে। আমার কি দুর্দশা দেখুন—দেহের দাস, মনের দাস, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস, একটা মন্দ কথার দাস, বাসনার দাস, সুখের দাস,জীবনের দাস, মৃত্যুর দাস—সব জিনিষের দাস! এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিরূপে?

———

১ কঠোপনিষদ্, ৫। ১৩

———

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, উহা লইয়া মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, অতঃপর উহার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে।১

অদ্বৈতবাদীর ইহাই সাধনপ্রণালী। সত্যের সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপর ক্রমাগত সেইটি মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে। সর্বদাইভাবুন-'আমি ব্রহ্ম', অন্য চিন্তা দুর্বলতাজনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে কোন চিন্তায় আপনাদিগকে নর-নারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা দূর করিয়া দিন, দেহ যাক, মন যাক, দেবতারাও যাক, ভূত-প্রেতাদিও যাক, সেই এক সত্তা ব্যতীত আর সবই যাক। যেখানে একজন আপর কিছু দেখে, একজন আপর কিছু শুনে, একজন অন্য কিছু জানে, তাহা ক্ষুদ্র বা সসীম; আর যেখানে একজন অপর কিছু দেখে না, একজন অপর কিছু শুনে না, আর যেখানে একজন অপর জানে না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা অনন্ত।২

তাহাই সর্বোত্তম বস্তু, যেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া যায়। যখন আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্তা, যখন আমিই আচার্য ও আমিই আমিই শিষ্য, যখন আমিই স্রষ্টা ও আমিই সৃষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যায়। কারণ আমাকে ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কে? দিনের পর দিন এই তত্ত্ব শুনিতে হইবে। অন্য সকল চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর সব কিছু দূরে ছুঁড়ে ফেলিয়া দিন, নিরন্তর হইয়া আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ না উহা হৃদয়ে পৌঁছায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমনকি প্রত্যেক শোনিত বিন্দু পর্যন্ত, 'আমি সেই, আমিই সেই' —এইভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ কর্ণের ভিতর দিয়া ঐ তত্ত্ব

ক্রমাগত ভিতরে পবেশ করাইতে হইবে। এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন-'আমিই সেই।' ভারতে এক সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি 'শিবোহহং, শিবোহহং' আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ 'শিবোহহং, শিবোহহং' ধ্বনি শুনা গিয়াছিল! মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রস্থলে, উচ্চতম পর্বত শিখরে, গভীরতম অরন্যে-যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বদা মনে মনে বলিতে থাকুন– 'আমি সেই, আমিই সেই'। দিন রাত্রি বলিতে থাকুন– 'আমিই সেই।' ইহা শ্রেষ্ঠ তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম।

---

১ বৃহ উপ., ৫। ৬
২ যত্র নান্যং নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা।
অথ যত্রান্যৎ পশ্যতান্যচ্ছৃণোত্যোন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্।।–ছান্দোগ্য উপ., ৭। ২৪

---

দুর্বল ব্যক্তি কখন আত্মা লাভ করিতে পারে না।১ কখনই বলিবেন না, 'হে প্রভো, আমি অতি অধম পাপী।' কে আপনাকে সাহায্য করিবে? আপনি জগতের সাহায্যকর্তা– আপনাকে আবার এ জগতে কে সাহায্য করিতে পারে? আপনাকে সাহায্য করিতে কোন্ মানুষ, কোন দেবতা বা কোন্ দৈত্য সমর্থ? আপনার উপর আবার কাহার শক্তি খাটিবে? আপনিই জগতের ঈশ্বর–আপনি আবার কোথায় সাহায্য আন্বেষণ করিবেন? যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবসতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার উত্তর দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি সাগ্রহে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, অপর কেহ আপনাকে সাহায্য প্রেরণ করিতেছে। আপনার বাহিরে আপনার সাহায্যকর্তা আর কেহ নাই–আপনিই জগতের স্রষ্টা। গুটিপোকার মতো আপনিই আপনার চারিদিকে গুটি নির্মাণ করিয়াছেন। কে

আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার ঐ গুটি কাটিয়া ফেলিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে—মুক্ত আত্মারূপে বাহির হইয়া আসুন। তখনই—কেবল তখনই আপনি সত্যদর্শন করিবেন। সর্বদা নিজের মনকে বলিতে থাকুন, 'আমিই সেই'। এই বাক্যগুলি আপনার মনের অপবিত্রতারূপ আবর্জনারাশি পুড়াইয়া ফেলিবে, আপনার ভিতরে পূর্ব হইতেই যে মহাশক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে, আপনার হৃদয়ে যে অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহা জাগাইয়া তুলিবে। সর্বদাই সত্য—কেবল সত্য শ্রবণ করিয়াই এই মহা শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। যেখানে দুর্বলতার চিন্তা আছে, সেদিকে ঘেঁষিবেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করুন।

———

১ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।—মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩। ২। ৪

———

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে সব দূর করুন। যতদূর পারেন, যুক্তি-তর্ক-বিচার করুন। তারপর যখন মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইহাই—কেবল ইহাই সত্য, আর কিছুই নয়, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বন্ধ করুন। তখন আর তর্কযুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্কযুক্তির প্রয়োজন কি? আপনি তো বিচার লাভ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, আপনি তো সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে আর এখন বাকি কি? এখন সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। অতএব বৃথা তর্কে এবং অমূল্যকাল-হরণে কি ফল? এখন ঐ সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে, আর যে কোন চিন্তা আপনাকে তেজস্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যাহা দুর্বল করে, তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মূর্তি-প্রতিমাদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহাই স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী, কিন্তু ইহাতে অতি মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতে হয়। যোগীরা তাহাদের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কেন্দ্র বা চক্রের উপর ধ্যান করেন এবং মনোমধ্যস্থ শক্তিসমূহ পরিচালনা করেন। জ্ঞানী বলেন, মনের অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তা দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উহাদের

চিন্তা করা অজ্ঞানোচিত কার্য। ঐরূপ করা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার মতো। জ্ঞানীর ধ্যানই সর্বাপেক্ষা কঠিন–নেতি নেতি; তিনি সব কিছুই অস্বীকার করেন, আর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্মক (বিলোম) সাধন। জ্ঞানী কেবল বিশ্লেষণ বলে জগৎটা আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। 'আমি জ্ঞানী' -এ কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী হওয়া বড়ই কঠিন। বেদ বলিতেছেনঃ

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরাধারের উপর দিয়া ভ্রমণ; কিন্তু নিরাশ হইও না। উঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষে পৌঁছিতেছ, ততদিন ক্ষান্ত হইও না।১

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার? জ্ঞানী দেহমন বিষয়ক সর্বপ্রকার চিন্তা অতিক্রম করিতে চান। তিনি যে দেহ, এই ধারণা দূর করিয়া দিতে চান। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যখনই আমি বলি, 'আমি স্বামী অমুক' তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব আসিয়া থাকে। তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর সবলে আঘাত করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা।' রোগই আসুক, অথবা অতি ভয়ানক আকারে মৃত্যুই আসিয়া উপস্থিত হউক, কে তাহা গ্রহ্য করে? আমি দেহ নই। দেহ সুন্দর রাখিবার চেষ্টা কেন? এই মায়া এই ভ্রান্তি–আর একবার উপভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য? দেহ যাক, আমি দেহ নই। ইহাই জ্ঞানীর সাধনপ্রণালী। ভক্ত বলেন, 'প্রভু আমাকে এই জীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, অতএব যতদিন না সেই যাত্রা শেষ হয়, ততদিন ইহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে।' যোগী বলেন, 'আমাকে অবশ্যই দেহের যত্ন করিতে হইবে, যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারি।' জ্ঞানী মনে করেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। তিনি এই মুহূর্তেই চরম লক্ষে পৌঁছিবেন। তিনি বলেন, 'আমি নিত্যমুক্ত, কোন কালেই বদ্ধ নই; অনন্তকাল ধরিয়া আমি এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ করিবে কে? আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ।' যখন কোন মানুষ স্বয়ং পূর্ণতা লাভ করে, সে অপরের মধ্যেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে। যখন অপরের মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ মনেরই ভাব বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে বুঝিতে হইবে। তাহার নিজের ভিতর যদি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে কিরূপে অপূর্ণতা

দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণতা বা অপূর্ণতা কিছুই গ্রহ্য করেন না। তাহার পক্ষে উহাদের কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। যখন তিনি মুক্ত হন, তখন হইতেই তিনি আর ভাল মন্দ দেখেন না। ভাল মন্দ কে দেখে?—যাহার নিজের ভিতর ভাল-মন্দ আছে। দেহ কে দেখে?—যে নিজেকে দেহ মনে করে। যে মুহূর্তে আপনি দেহভাব-রহিত হইবেন, সেই মুহূর্তেই আপনি আর জগৎ দেখিতে পাইবেন না। উহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জ্ঞানী কেবল বিচার-জনিত সিদ্ধান্তবলে এই জড়বন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই 'নেতি, নেতি' মার্গ।

———

১ তুলনীয়ঃ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।—কঠ. উপ, ১।৩।১৪

# ৭. আত্মার একত্ব

পূর্ব বক্তৃতায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ্১ হইতে কিছু পাঠ করিয়া শুনাইব। তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কিরূপে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত।

যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। আপনারা অবশ্য জানেন, ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বয়স হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন 'প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, এই আমার যাহা কিছু অর্থ, বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লও।'

মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'ভগবান্, ধনরত্নে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি তাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিব?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ' না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকেরা যেরূপে জীবনধারণ করে, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে; কারণ ধনের দ্বারা কখনও আমৃতত্ব লাভ করা যায় না।'

মৈত্রেয়ী কহিলেন, 'যাহা দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারি, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি সে উপায় আপনার জানা থাকে, আমাকে তাহাই বলুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তুমি বরাবরই আমার প্রিয় ছিলে, এখন এই প্রশ্ন করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে। এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। তুমি উহা শুনিয়া ধ্যান করিতে থাকো।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেনঃ

'হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে' ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। সন্তানগণকে কেহ তাহাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতুই সন্তানগণকে ভালবাসিয়া থাকে। অর্থকে কেহ অর্থের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নয়, কিন্তু আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে

ব্রাহ্মণকে ভালবাসিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কেও লোকে ক্ষত্রিয়ের জন্য ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসিয়া থাকে। এজগৎকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু জগৎ তাহার প্রিয়। দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই দেবগণের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু দেবগণ তাহার প্রিয়। অধিক কি, কোন বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নয়, কিন্তু তাহার যে আত্মা বিদ্যমান, তাহার জন্যই সে ঐ বস্তুকে ভলবাসে, অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত হয়।'

এই উপদেশের তাৎপর্য কি? এরকম অদ্ভুত রকমের দর্শন। আমরা জগত বলিতে যাহা কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই, আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, সর্বপ্রকার প্রেমই স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতার যতদূর নিম্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই স্বার্থপরতাপ্রসূত; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেইহেতু অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। বর্তমান কালেও অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, 'স্বার্থই জগতে সকল কার্যের একমাত্র প্রেরণাদায়িনী শক্তি।' এ কথা এক হিসাবে সত্য, আবার অন্য হিসাবে ভুল। আমাদের এই 'আমি' সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মার ছায়ামাত্র, যিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন। আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র 'আমি'র উপর ভালবাসা অন্যায় ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্ব আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাই সসীমভাবে দৃষ্ট হইলে মন্দ বলিয়া বোধ হয়, স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হয়। এমনকি স্ত্রীও যখন স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসিতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতা-রূপে ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মভাবেরই ক্ষুদ্র অংশ। যখনই কেহ কিছু ভালবাসে, তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয়।

এই আত্মাকে জানিতে হইবে। যাহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা। যাঁহারা আত্মাকে জানিয়া উহাকে ভালবাসেন, তাহাদের

ভালবাসায় কোনরূপ বন্ধন নাই, তাহারা পরম জ্ঞানী। কেহই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই সে ব্রাহ্মণকে ভালবাসে।

'ব্রাহ্মণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক দেখেন; ক্ষত্রিয় তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক দেখেন; লোকসমূহ বা জগৎ তাহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক দেখেন; দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বিশ্বাস করেন।...সকল বস্তুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাহাদিগকে, আত্মা হইতে পৃথকরূপে দর্শন করেন। এই ব্রহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ....এমনকি যাহা কিছু জগতে আছে, সবই আত্মা।'

এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ভালবাসা বলিতে তিনি কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা বুঝাইলেন। যখনই আমরা এই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি, তখনই যত গোলমাল। মনে করুন, আমি কোন নারীকে ভালবাসি, যদি আমি সেই নারীকে আত্মা হইতে পৃথকভাবে, বিশেষ ভাবে দেখি, তবে উহা আর শাশ্বত প্রেম হইল না। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর দুঃখই উহার পরিণাম; কিন্তু যখনই আমি সেই নারীকে আত্মারূপে দেখি তখনই সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইরূপ যখনই আপনারা সমগ্র হইতে বা আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া জগতের কোন এক বস্তুতে আসক্ত হন, তখনই তাহাতে প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভাবিয়া ও আত্ম-রূপে, সম্ভোগ করি, তাহা হইতে কোন দুঃখ কষ্ট বা প্রতিক্তিয়া আসিবে না। ইহাই পূর্ণ আনন্দ।

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঐ অবস্থা লাভ করিবার প্রণালী বলিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত; আত্মাকে না জানিয়া জগতের প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে?

‘যদি দুন্দুভি বাজিতে থাকে, আমরা উহা হইতে উৎপন্ন শব্দ-লহরীগুলি পৃথকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু দুন্দুভির সাধারণ ধ্বনি বা আঘাত হইতে ধ্বনিসমূহ গৃহীত হইলে ঐ বিভিন্ন শব্দলহরীও গৃহীত হইয়া থাকে।

‘শঙ্খ নিনাদিত হইলে উহার স্বরলহরী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু শঙ্খের সাধারণ ধ্বনি অথবা বিভিন্নভাবে নিনাদিত শব্দরাশি গৃহীত হইলে শব্দলহরীগুলিও গৃহীত হয়।

‘বীণা বাজিতে থাকিলে উহার বিভিন্ন স্বরগ্রাম পৃথকভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু বীনার সাধারণ সুর অথবা বিভিন্নরূপে উত্থিত সুরসমূহ গৃহীত হইলে ঐ স্বরগ্রামগুলিও গৃহীত হয়।

‘যেমন কেহ ভিজা কাঠ জ্বালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানাপ্রকার ধুম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেরূপ সেই মহান পুরুষ হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা—এই সমস্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয়। সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাস-স্বরূপ।

‘যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদয় স্পর্শের একমাত্র আশ্রয় ত্বক, যেমন সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নাসিকা, যেমন সমুদয় রসের একমাত্র আশ্রয় জিহ্বা, যেমন সমুদয় রূপের একমাত্র আশ্রয় চক্ষু, যেমন সমুদয় শব্দের একমাত্র আশ্রয় কর্ণ, যেমন সমুদয় চিন্তার একমাত্র আশ্রয় মন, যেমন সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমুদয় কর্মের একমাত্র আশ্রয় হস্ত, যেমন সমুদয় বাক্যের একমাত্র আশ্রয় বাগিন্দ্রিয়, যেমন সমুদ্র—জলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত রহিয়াছে অথচ উহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সব কিছু। তিনি বিজ্ঞানঘন। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই ডুবিয়া যায়। কারণ তাহার নিকট পৌঁছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই।’

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলিঙ্গাকারে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছি, আর তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই।

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, সর্বত্রই লোকে যেমন হইয়া থাকে। মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'ভগবান্, আপনি এইখানে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিলেন। দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, 'আমি' জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যাইবে—এ কথা বলিয়া আপনি আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছেন। যখন আমি ঐ অবস্থা পৌঁছিব, তখন কি আমি কি আত্মাকে জানিতে পারিব? অহংজ্ঞান হারাইয়া তখন অজ্ঞান-অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অথবা আমি তাহাকে জানিতেছি এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাকেও জানিবার, কিছু অনুভব করিবার, কাহাকেও ভালবাসিবার, কাহাকেও ঘৃণা করিবার থাকিবে না?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'মৈত্রেয়ী, মনে করিও না যে আমি মোহজনক কথা বলিতেছি, তুমি ভয় পাইও না। এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। যে অবস্থায় দুই থাকে অর্থাৎ যাহা দ্বৈতাবস্থা, তাহা নিম্নতর অবস্থা। যেখনে দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, সেখানে একজন অপরকে দর্শন করে, সেখানে একজন অপরকে শ্রবণ করে, সেখানে একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখনই সব আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহার ঘ্রাণ লইবে, কে কাহাকে দেখিবে, কি কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিতে পারে? এই আত্মাকে কেবল 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাঁহার কখন ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই তিনি প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। তিনি পূর্ণ, সমুদয় সুখ দুঃখের অতীত। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে? কি উপায়ে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি? কোন উপায়েই নয়। হে মৈত্রেয়ি, ইহাই ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইলেই তাহাকে লাভ করা হয়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।'

এতদূর পর্যন্ত এই ভাব পাওয়া গেল যে, এই সমুদয়ই এক অনন্ত পুরুষ আর তাঁহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব–সেখানে কোন ভাগ বা অংশ নাই, ভ্রমাত্মক নিম্নভাবগুলির কিছুই নাই। কিন্তু তথপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর আগাগোড়া সেই অনন্ত যথার্থ আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছে : সমুদয়ই আত্মার অভিব্যক্তিমাত্র। কি করিয়া আমরা এই আত্মাতে লাভ করিব? যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, 'প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, তারপর বিচার করিতে হইবে, তারপর উহার ধ্যান করিতে হইবে।' ঐ পর্যন্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ববস্তুর সাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর সেই আত্মার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমনের শান্তভাব সম্বন্ধে বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞাতা আত্মাকে সীমাবদ্ধমনের দ্বারা জানা অসম্ভব। যদি আত্মাকে জানিতে না পারা যায়, তবে কি করিতে হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদিও আত্মাকে জানা যায় না, তথাপি উহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই জগত সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী; কারণ উভয়েই পরস্পরের অংশী–একের উন্নতি অপরের উন্নতির সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহায্যকারী কেহ হইতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ অনন্তস্বরূপ। জগতে যতকিছু আনন্দ আছে, এমনকি খুব নিম্নস্তরের আনন্দ পর্যন্ত, ইহারই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর ঐ প্রতিবিম্ব যখন অপেক্ষকৃত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা যায়। যখন এই আত্মা কম অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে; যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভালমন্দ কেবল মাত্রার তারতম্য, আত্মার কম বেশী অভিব্যক্তি লইয়া। আমাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ছেলেবেলা কত জিনিসকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ। আবার কত জিনিসকে মন্দ বলিয়া দেখি, বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্তন হয়! একটা ভাব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে! আমরা এক সময় যাহা খুব ভাল বলিয়া ভাবিতাম, এখন আর তাহা সেরূপ ভাল ভাবি না। এইরূপে ভালমন্দ

আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মার প্রকাশমাত্র। আত্মা সব কিছুতে প্রকাশ পাইতেছেন; কেবল তাহার প্রকাশ অল্প হইলে আমরা মন্দ বলি এবং স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্তু আত্মা স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহা কিছু আছে সবকেই প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ সবই সেই পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি। তিনি ভালও নন, মন্দও নন; তিনি পূর্ণ, আর পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই হইতে পারে। ভাল জিনিস অনেক প্রকার হইতে পারে, মন্দও অনেক থাকিতে পারে, ভাল মন্দের মধ্যে প্রভেদের নানাবিধ মাত্রা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই; ঐ পূর্ণ বস্তু বিশেষ বিশেষ প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়া আমরা অভিহিত করি, অন্য প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে উহাকে আমরা মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল, ঐ বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ-এরূপ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এই জিনিস বেশী ভাল, ঐ জিনিস কম ভাল, আর কম ভালকেই আমরা মন্দ বলি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই সর্বপ্রকার দ্বৈত ভ্রম প্রসূত হইয়াছে। উহারা সকল যুগের নরনারীর বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে ঘৃনা করি, তাহার কারণ শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই সব মূর্খজনোচিত ধারণা। মানজাতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা ভাল মন্দের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে। এখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে কি উপদেশ দিতেছেন, শোনা যাকঃ

‘এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দ জনক, সকল প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু উভয়েই পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। আর ইহাদের সেই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে আসিতেছে।’

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক, পাপীতেই হউক, মহাপুরুষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হউক, দেহেই হউক, মনেই হউক বা ইন্দ্রিয়েই হউক,সেখানেই তিনি

আছেন সেই এক পুরুষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নিম্নতম ইন্দ্রিয়সুখও তিনি, আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিতেছেন। যখন আপনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন; যখন মাতালের পানাশক্তি ও সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব–এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন। তখনই কেবল আপনি বুঝিবেন-সুখ কাহাকে বলে, শান্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, মূর্খের মতো ছেলেমানুষী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্বপ্রকার দুঃখ আসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিত্তিস্বরূপ উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন–সবই তাহার মধুরত্বের অভিব্যক্তিমাত্র। এই দেহটিও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ–আর সেই দেহের সমুদয় শক্তির ভিতর দিয়া, মনের সর্বপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। ‘এই জগত সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়’, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম।

‘এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, আর এই বায়ুর নিকটও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ৰায়ুতেও রহিয়াছেন এবং দেহেও রহিয়াছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।’

‘এই সূর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় পুরুষ সূর্যে রহিয়াছেন এবং তাহারই প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদয়ই তাঁহার প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও রহিয়াছেন এবং তাহারই ঐ প্রতিবিম্ব-বলে আমরা আলোক দর্শনে সমর্থ হইতেছি।’

‘এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা-স্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মন-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।’

‘এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মাস্বরূপ আর তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ সবই সেই ব্রহ্ম।’

‘সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা সকল প্রাণীর রাজা।’

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী; ঐগুলি ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ : পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন। পৃথিবীকে চিন্তা করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে, পৃথিবীতে যাহা আছে, আমাদের দেহেও তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহ এক করিয়া ফেলুন, আর দেহস্থ আত্মার সহিত পৃথিবীর অন্তর্বর্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন। বায়ুকে বায়ুর ও আপনার অভ্যন্তরবর্তী আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। এইরূপে সকল ধ্যান করিতে হয়। এ-সবই এক, শুধু বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য—এই একত্ব উপলব্ধি করা, আর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

———-

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪র্থ আধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য। এই আধ্যায়ের প্রায় সমুদয়ই ঐ দুই অংশের ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যামাত্র।

# ৮. জ্ঞানাযোগের চরমাদর্শ

অদ্যকার বক্তৃতাতেই সাংখ্য ও বেদান্তবিষয়ক এই বক্তৃতাবলী সমাপ্ত হইবে; অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, অদ্য সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব। বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের অতি প্রাচীন ধর্মভাবের কয়েকটির বিবরণ পাইয়া থাকি। মহর্ষি কপিল খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু এই সলক ভাব তাঁহা অপেক্ষা প্রাচীনতর। সাংখ্যদর্শনে কপিলের উদ্ভাবিত নূতন কোন মতবাদ নয়। তাঁহার সময়ে ধর্মসম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহা হইতে একটি যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তিনি ভারতবর্ষে এমন এক 'মনোবিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা হিন্দুদের বিভিন্ন আপাতবিরোধি দার্শনিকসম্প্রদায়সমূহ এখনও মানিয়া থাকে। পরবর্তী কোন দার্শনিকই এ পর্যন্ত মানব মনের ঐ অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের উপর যাইতে পারেন নাই; কপিল নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান; তিনি যতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদ আর এক পদ অগ্রসর হইল। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া চরম একত্বে পৌঁছিল।

কপিলের সময়ের পূর্বে ভারতে যে সকল ধর্মাভাব প্রচলিত ছিল—আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্মভাবগুলির কথাই বলিতেছি, কিন্তু নিম্নগুলি তো ধর্মের নামে অযোগ্য—সেগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, প্রথমগুলির ভিতর প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র প্রভৃতির ধারণা ছিল। অতি প্রাচীন অবস্থায় সৃষ্টির ধারণা বড়ই বিচিত্র ছিল : সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব বা শূন্য হইতেই এই সমুদয় আসিয়াছে। পরবর্তী সোপানে আমরা দেখিতে পাই, এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। বেদান্তের প্রথম সোপানেই এই প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায় : অসৎ(অনস্তিত্ব) হইতে সতের(অস্তিত্বের) উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? যদি এই জগৎ সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়, তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে।

প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্য হস্তের দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহারই তো উপাদান কারণ প্রয়োজন। অতএব প্রাচীন হিন্দুরা স্বভাবতই এই জগৎ যে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রাথমিক ধারণা ত্যাগ করিলেন, আর এই জগৎসৃষ্টির কারণীভূত উপাদান কি, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাস– 'কোন্ পদার্থ হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল?' –এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় উপাদান কারণের অন্বেষনমাত্র। নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা–এই প্রশ্ন ব্যতীত, চিরকালই এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 'ঈশ্বর কী উপাদান লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দর্শন নির্ভর করিতেছে।

একটি সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্মা–তিনই নিত্য বস্তু, উহারা যেন তিনটি সমান্তরাল রেখার মতো অনন্তকাল পাশাপাশি চলিয়াছে; উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাঁহারা অ-স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য মনোবিজ্ঞান প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব হইতেই এই সকল ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঐ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ানুভূতির প্রণালী এইরূপ : প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের শরীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্যবিষয়ে আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বারা বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে (স্নায়ুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ– উহাকে তাহারা 'আত্মা' বলেন। আধুনিক শরীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাঁহার আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব

বিধান করিতেছে, শরীরবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্য-মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য এই একীভাব, যাহার উপর বিষয়ানুভূতিগুলি প্রতিবিম্ব হইবে, এমন কিছু প্রয়োজন। সেই কিছু না থাকিলে আমি আপনার বা ঐ ছবিখানার বা অন্য কোন বস্তুরই কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের ভিতর এই একত্ব-বিধায়ক কিছু না থাকিত, তবে আমরা হয়তো কেবল দেখিতেই লাগিলাম, খানিক পরে শুনিতে লাগিলাম, খানিক পরে স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম, আর এমন হইত যে, একজন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, কিন্তু তাহাকে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন।

এই দেহ জড়পরমাণু গঠিত, আর ইহা জড় ও অচেতন। যাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়, তাহাও ঐরূপ। সাংখ্যের মতে সূক্ষ্ম শরীর অতি সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত একটি ক্ষুদ্র শরীর-উহার পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোনপ্রকার অনুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও ঐগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্ম দেহের প্রয়োজন কি? আমরা যাহাকে 'মন' বলি, উহা তাহার আধার স্বরূপ। যেমন এই স্থূল শরীর স্থূলতর শক্তিসমূহের আধার, সেরূপ সূক্ষ্ম শরীর চিন্তা উহার নানাবিধ বিকারস্বরূপ সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহের আধার। প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর-ইহা স্থূল জড় ও স্থূল শক্তিময়। জড় ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, কারণ কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে। অতএব স্থূলতর শক্তিসমূহ এই স্থূল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্য করিতে পারে এবং অবশেষে ঐগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলভাবে কার্য করিতেছে তাহাই সূক্ষ্মতররূপে কার্য করিতে থাকে এবং চিন্তারূপে পরিণত হয়। উহাদের মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তুর একটি স্থূল অপরটি সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যেও উপাদানগত কোন ভেদ নাই। সূক্ষ্ম শরীরও জড়, তবে উহা খুব সূক্ষ্ম জড়।

এই সকল শক্তি কোথা হইতে আসে? বেদান্তদর্শনের মতে–প্রকৃতি দুইটি বস্তুতে গঠিত। একটিকে তাহারা 'অকাশ' বলেন, উহা অতি সূক্ষ্ম জড়, আর অপরটিকে তাহারা 'প্রাণ'

বলেন। আপনারা পৃথিবী, বায়ু বা অন্য যাহা কিছু দেখেন, শুনেন বা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেন, তাহাই জড়; এবং সবগুলিই এই আকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। উহা প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, কখন স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী—সর্ববস্তুতে অনুস্যূত। আকাশ যেন জলের মতো এবং জগতে আর যাহা কিছু আছে, সবই বরফখণ্ডের মতো, ঐগুলি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলেই ভাসিতেছে; আর প্রাণই সেই শক্তি, যাহা আকাশে এই বিভিন্নরূপে পরিণত করিতেছে।

পৈশকিগতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা প্রভৃতি প্রণের স্থূলরূপ প্রকাশের জন্য এই দেহয়ন্ত্র আকাশ হইতে নির্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্মশরীরও সেই প্রাণের চিন্তারূপ সূক্ষ্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্য আকাশ হইতে—আকাশের সূক্ষ্মতর রূপ হইতে নির্মিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে এই স্থূল শরীর, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, তারপর জীব বা আত্মা—উহাই যথার্থ মানব। যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা আমাদের শরীরেরই অংশ, উহা হইতে পৃথক নয়, তেমনি আমাদের শরীর দুইটি নয়। মানুষের একটি সূক্ষ্ম শরীরআর একটি স্থূল শরীর আছে, তাহা নয়; শরীর একই, তবে সূক্ষাকারে উহা অপেক্ষকৃত দীর্ঘকাল থাকে, আর স্থূলটি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বৎসরে শতবার নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেরূপ একযুগে আমি লক্ষ লক্ষ স্থূল শরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যাইবে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব অর্থাৎ যথার্থ ‘মানুষ’ সূক্ষ্ম-অতি সূক্ষ্ম।

এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, যাহা অতি শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর সূক্ষ্ম শরীর—উহা যুগ যুগ ধরিয়া বর্তমান থাকে, তারপর জীবাত্মা। বেদান্তদর্শনের মতে ঈশ্বর যেমন নিত্য, এই জীবও সেইরূপ নিত্য, আর প্রকৃতিও নিত্য, তবে উহা প্রবাহরূপে নিত্য। প্রকৃতির উপাদান আকাশ ও প্রাণ নিত্য, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া উহারা বিভিন্ন আকারে পরিবর্তিত হইতেছে। জড় ও শক্তি নিত্য, কিন্তু উহাদের সমবায়সমূহ সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব—আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতেই নির্মিত নয়, উহা অ-জড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে। উহা প্রাণ ও আকাশের কোনরূপ

সংযোগের ফল নয়, আর যাহা সংযোগের ফল নয়, তাহা কখন নষ্ট হইবে না; কারণ বিনাশের অর্থ সংযোগের বিশ্লেষণ। যে কোন বস্তু যৌগিক নয়, তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। স্থূল শরীর আকাশ ও প্রণের নানারূপ সংযোগের ফল, সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। সূক্ষ্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ, সুতরাং উহা কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। ঐ একই কারণে আমরা বলিতে পারি না, জীবের কোনকাল জন্ম হইয়াছে। কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেবল যাহা যৌগিক, তাহারই জন্ম হইতে পারে।

লক্ষ কোটি প্রকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার শাসনাধীনে রহিয়াছে। কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই—থাকিতেই পারে না। তিনিই শাস্তা। ইহাই দ্বৈত বেদান্তের উপদেশ।

তারপর এই প্রশ্ন আসিতেছে : ঈশ্বর যদি এই জগতের শাস্তা হন, তবে তিনি কেন এমন কুৎসিত জগৎ সৃষ্টি করিলেন? কেন আমরা এত কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া হইয়া থাকে : ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেইরূপ শস্যই পাইয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কিছু করেন না। যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, অন্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে সে ঐভাবে জন্মিবার পূর্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এইরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। জীব চিরকাল বর্তমান আছে, কখন সৃষ্ট হয় নাই; চিরকাল ধরিয়া নানারূপ কার্য করিতেছে। আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। যদি শুভকর্ম করি, তবে আমরা সুখলাভ করিব, অশুভ কর্ম করিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব, তবে দ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞান উহার স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। যেমন অসৎ কর্মের দ্বারা উহা নিজেকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তেমনি শুভকর্মের দ্বারা উহা নিজস্বরূপ পুনরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তেমনই শুদ্ধ। প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ। যখন শুভকর্মের দ্বারা উহার পাপ ও অশুভ কর্ম ধৌত

হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয়, তখন সে মৃত্যুর পর দেবযান-পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। যদি সে সাধারণভাবে ভাল লোক হয়, সে পিতৃলোকে গমন করে। স্থূলদেহের পতন হইলে বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারা যায় না; যেখানেই বাক্য সেখানেই চিন্তা বিদ্যমান। মন আবার প্রাণে লীন হয়, প্রাণ জীবে লয়প্রাপ্ত হয়; তখন দেহত্যাগ করিয়া জীব তাঁহার অতীত জীবনের কর্ম দ্বারা অর্জিত পরস্কার বা শাস্তির যোগ্য এক অবস্থায় গমন করে। দেবলোক আর্থে দেবগণের বাসস্থান। 'দেব' শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা প্রকাশস্বভাব। খ্রীষ্টান বা মুসলমানেরা যাহাকে এঞ্জেল ( Angel) বলেন, 'দেব' বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহাদের মতে–দান্তে তাঁহার 'ডিভাইন কমেডি' ( Divine Comedy) কাব্যগ্রন্থে যেরূপ নানাবিধ স্বর্গলোকের বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা তাহারই মতো নানা প্রকার স্বর্গলোক আছে। যথা পিতৃলোক, দেবলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক–ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে জীব ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার নর-জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, তিনি সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছেন, যাহারা সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা ও তদীয় নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত অর কিছু করিতে চান না, তাঁহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠ গতি হয়। ইঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরের দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা শুভ কর্ম করেন বটে, কিন্তু সেজন্য পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ঐ শুভকর্মের বিনিময়ে স্বর্গে যাইতে চান। মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবাত্মা চন্দ্রলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। জীবাত্মা দেবতা হন। দেবগণ অমর নন, তাঁহাদিগকেও মরিতে হয়। স্বর্গেও সকলেই মরিবে। মৃত্যুশূন্য স্থান কেবল ব্রহ্মলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। আমাদের পুরাণে দৈতগনেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেবগণকে আক্রমণ করেন। সর্বদেশের পুরাণেই এই দেব দৈত্যের সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে দৈত্যেরা দেবগণের উপর জয়লাভ করিয়া থাকে। সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয়া যায় যে, দেবগণ সুন্দরী মানব-দুহিতাদের ভালবাসে। দেবরূপে জীব কেবল তাহার অতীত কর্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু কোন

নূতন কর্ম করেন না। কর্ম-অর্থে যে-সকল কার্য ফলপ্রসব করিবে, সেইগুলি বুঝাইয়া থাকে, আবার ফল গুলিকেও বুঝাইয়া থাকে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় এবং সে একটি দেব-দেহ লাভ করে, তখন সে কেবল সুখভোগ করে, নূতন কোন কর্ম করে না। সে তাহার অতীত শুভকর্মের পুরস্কার ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন ঐ শুভকর্মের ফল শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহার অন্য কর্ম ফলোন্মুখ হয়।

বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে পুরাণকারগণ—আমাদের পরবর্তী কালের শাস্ত্রকারগণ—ভবিয়াছিলেন, নরক না থাকিলে কোন ধর্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা নানাবিধ নরক কল্পনা করিলেন।দান্তে তাহার 'নরকে' ( Inferno) যত প্রকার শাস্তি কল্পনা করিয়াছেন, ইঁহারা ততপ্রকার, এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকার নরক যন্ত্রণার কল্পনা করিলেন। তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া বলেন, এই শাস্তি কিছুকালের জন্য মাত্র। ঐ অবস্থায় অশুভ কর্মের ফলভোগ হইয়া উহা ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার উন্নতি করিবার সুযোগ পায়। এই মানবদেহেই উন্নতিসাধনের বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। এই মানব দেহকে 'কর্মদেহ' বলে, এই মানব দেহেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটি বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এই কারণেই আন্যান্য সর্বপ্রকার দেহ অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দেবগণ অপেক্ষাও মানুষ মহত্তর। দেবগণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই পর্যন্ত দ্বৈত-বেদান্তের আলোচনা।

তারপর বেদান্ত দর্শনের আর ঐক উচ্চতর ধারণা আছে—সেদিক হইতে দেখিলে এগুলি অপরিণত ভাব। যদি বলেন ঈশ্বর অনন্ত, জীবাত্মাও অনন্ত, এবং প্রকৃতিও অনন্ত, তবে এইরূপ অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ করা অযৌক্তিক; কারণ এই অনন্তগুলি পরস্পরকে সসীম করিয়া ফেলিবে এবং প্রকৃত অনন্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; তিনি নিজের ভিতর হইতে এই জগৎ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। এ-কথার অর্থ কি এই যে, ঈশ্বরই এই দেওয়াল, এই টেবিল, এই পশু, এই হত্যাকারী এবং জগতের যা কিছু সব মন্দ

হইয়াছেন? ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ; তিনি কিরূপে এ-সকল মন্দ জিনিস হইতে পারেন?—না, তিনি এ-সব হন নাই। ঈশ্বর অপরিণামী, এসকল পরিণাম প্রকৃতিতে; যেমন আমি অপরিণামী আত্মা, অথছ আমার দেহ আছে। এক অর্থে—এই দেহ আমা হইতে পৃথক নয়, কিন্তু আমি—যথার্থ আমি কখনই দেহ নই। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বা বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে আমার আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। উহা যে আত্মা, সেই আত্মাই থাকে। এইরূপে প্রকৃতি এবং অন্ত-আত্মা-সমন্বিত এই জগৎ যেন ঈশ্বরের অনন্ত শরীর। তিনি ইহার সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তিনি একমাত্র অপরিণামী। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী এবং আত্মাগুলিও পরিণামী। প্রকৃতির কিরূপ পরিণাম হয়? প্রকৃতির রূপ বা আকার ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, উহা নূতন নূতন আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু আত্মাতো এইরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্মাই অশুভ কর্ম দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। যে-সকল কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিত্রতা সঙ্কুচিত হয়, সেগুলিকেই 'অশুভ কর্ম' বলে। যে সকল কর্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক মহিমা প্রকাশ করে, সেগুলিকে 'অশুভ কর্ম' বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধস্বভাব ছিল, কিন্তু নিজ নিজ কর্ম দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় ও শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইবে ও পুনরায় শুদ্ধস্বরূপ হইবে। প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তিলাভের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে এবং কালে সকলেই শুদ্ধস্বরূপ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জগৎ শেষ হইয়া যাইবে না, কারণ উহা অনন্ত। ইহাই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটিকে 'দ্বৈত বেদান্ত' বলে; আর দ্বিতীয়টি—যাহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরূপ আর ঐ তিনে মিলিয়া এক-ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত' বলে। আর এই মতাবলম্বিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। এই মতেও ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুই-ই। সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন।

'ঈশ্বর আত্মা স্বরূপ আর জগৎ যেন তাঁহার দেহ স্বরূপ আর সেই দেহের পরিণাম হইতেছে' —বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, তবে আর

ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান-কারণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদানকারণ অর্থে যে কারণটি কার্যরূপ ধারণ করিয়াছে। কার্য কারণের রূপান্তর বই আর কিছুই নয়। যেখানেই কার্য দেখা যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, কারণই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি জগৎ কার্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, তবে এই জগৎ অবশ্যই ঈশ্বরের রূপান্তর মাত্র। যদি বলা হয়, জগৎ ঈশ্বরের শরীর, আর ঐ দেহ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া কারণ হয় এবং পরে আবার সেই কারণ হইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন। এখন একটি অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে। যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া থাকেন, তবে সবই ঈশ্বর। অবশ্য সবই ঈশ্বর। আমার দেহও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, আমার আত্মাও ঈশ্বর। তবে এত জীব কোথা হইতে অসিল? ঈশ্বর কি লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনন্ত পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিরূপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনন্তকে বিভাগ করা অসম্ভব। তবে কিভাবে সেই শুদ্ধসত্তা (সৎস্বরূপ) এই জগৎ হইলেন? যদি তিনি জগৎ হইয়া থাকেন, তবে তিনি পরিণামী, পরিণামী হইলেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত, যাহা কিছু প্রকৃতির অন্তর্গত তাহারই জন্ম মৃত্যু আছে, যদি ঈশ্বর পরিণামী হন, তবে তাঁহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এইটি মনে রাখিবেন। আর একটি প্রশ্ন : ঈশ্বরের কতখানি এই জগৎ হইয়াছে? যদি বলেন ঈশ্বরের 'ক' অংশ জগৎ হইয়াছে, তবে ঈশ্বর='ঈশ্বর'-ক; অতএব সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই; কারণ তাঁহার কিছুটা অংশ জগৎ হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই, ইহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। এই দেবতা, স্বর্গ, জন্মমৃত্যু, অনন্ত সংখ্যক আত্মা আসিতেছে, যাইতেছে—এই সবই কেবল স্বপ্নমাত্র। সমুদয়ই সেই এক অনন্তস্বরূপ। একই সূর্য বিবিধ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ দেখাইতেছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে লক্ষ লক্ষ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই সূর্যের সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি রহিয়াছে; কিন্তু সূর্য প্রকৃতপক্ষে একটি। এই সকল জীব সম্বন্ধেও সেই কথা—তাহারা সেই এক অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্বমাত্র। স্বপ্ন কখন সত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য—সেই এক অনন্ত সত্তা। শরীর, মন বা জীবাত্মাভাবে ধরিলে আপনি

স্বপ্নমাত্র, কিন্তু আপনার যথার্থ স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই সব জন্ম, পূনর্জন্ম, এই আসা-যাওয়া—এ-সব সেই স্বপ্নের অংশমাত্র। আপনি অনন্তস্বরূপ। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? সূর্য, চন্দ্র ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার যথার্থ স্বরূপের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ কিরূপে হইবে? আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেনও না; আত্মার কোনকালে পিতামাতা, শত্রুমিত্র কিছুই নাই; কারণ আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে মানুষের চরম লক্ষ্য কি?- এই জ্ঞানলাভ করা ও জগতের সহিত এক হইয়া যাওয়া। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমনকি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এই সমুদয় স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, আর তাহারা নিজদিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা তাঁহাদের যথার্থ 'আমিত্ব' লাভ করেন—আমরা এখন যে ক্ষুদ্র অহংকে এত বড় একটা জিনিস বলিয়া মনে করিতেছি, উহা তাহা হইতে অনেক দূরে। আমিত্ব নষ্ট হইবে না-অনন্ত ও সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখবোধ আর থাকিবে না। আমরা এখন এই ক্ষুদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া সুখ পাইতেছি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহ বলিয়া বোধ হইবে, তখন আমরা কত অধিক সুখ পাইব? এই পৃথক্ পৃথক্ দেহে যদি এত সুখ থকে, তবে যখন সকল দেহ এক হইয়া যাইবে, তখন আরও কত অধিক সুখ! যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াছে, সে-ই মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে এই স্বপ্ন কাটাইয়া তাহার পারে চলিয়া গিয়াছে, নিজের যথার্থ স্বরূপ জানিয়াছে। ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের উপদেশ।

বেদান্তদর্শন একটির পর একটি সোপানত্রয় অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, আর আমরা ঐ তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ আমরা একত্বের পর আর যাইতে পারি না।

যাহা হইতে জগতের সবকিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণ একস্বরূপের ধারণার বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। এই অদ্বৈতবাদ সকলে গ্রহণ করিতে পারে না; সকলের দ্বারা গৃহীত হইবার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন। প্রথমতঃ বুদ্ধিবিচারের দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝা

অতিশয় কঠিন। ইহা বুঝিতে তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ উহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই উপযোগী নয়।

এই তিনটি সোপানের মধ্যে প্রথমটি হইতে আরম্ভ করা ভাল। ঐ প্রথম সোপানটির সম্বন্ধে চিন্তাপূর্বক ভাল করিয়া বুঝিলে দ্বিতীয়টি আপনিই খুলিয়া যাইবে। যেমন একটি জাতি ধীরে ধীরে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হয়, ব্যক্তিকেও সেইরূপ করিতে হয়। ধর্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে মানবজাতিকে যে সকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল প্রভেদ এই যে, সমগ্র মানবজাতির এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তি মানব কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করিয়া ফেলিতে পারেন, অথবা আরও শীঘ্র—হয়তো ছয় মাসের মধ্যেই পারেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই এই সোপানগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা যখন ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন, নিজেদের জীবনের সেই সময়ের কথা অবশ্যই মনে করিতে পারেন। যখনই আপনারা নিজদিগকে দেহ ও মন বলিয়া ভাবেন, তখন আপনাদিগকে এই স্বপ্নের সমগ্রটাই লইতে হইবে। একটি ভাব লইলেই সমুদয়টি লিতে হইবে। যে ব্যক্তি বলে জগৎ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ যদি জগৎ থাকে, তবে জগতের একটা কারণও থাকিবে, আর সেই কারণের নামই ঈশ্বর। কার্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে, অবশ্য জানিতে হইবে। যখন জগৎ অন্তর্হিত হইবে, তখন ঈশ্বরও অন্তর্হিত হইবেন। যখন আপনি ঈশ্বরের সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিবেন, তখন আপনার পক্ষে আর এই জগৎ থাকিবে না। কিন্তু যতদিন এই স্বপ্ন আছে, ততদিন আমরা আমাদিগকে জন্মমৃত্যুশীল বলিয়া মনে করিতে বাধ্য, কিন্তু যখনই 'আমার দেহ'-এই স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে 'আমরা জন্মাইতেছি ও মরিতেছি'—এ স্বপ্নও অন্তর্হিত হইবে, এবং 'একটা জগৎ আছে'—এই স্বপ্নও চলিয়া যাইবে।

যাহাকে আমরা এখন এই জগৎ বলিয়া দেখিতেছি, তাহাই আমাদের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং যে-ঈশ্বরকে এতদিন আমরা বাহিরে অবস্থিত বলিয়া

জানিতেছিলাম, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মারূপে প্রতীত হইবেন। অদ্বৈতবাদের শেষ কথা ‘তত্ত্বমসি’—তাহাই তুমি।